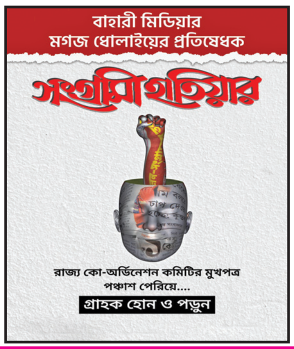

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

নবম-দশম সংস্করণ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ■ ৫০তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক কর্মচারীদের "চোর-ডাকাত" বলার প্রতিবাদে ৬ এপ্রিল ২০২৩ রাজ্যজুড়ে পালিত হল একদিনের সফল কর্মবিরতি

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে সর্বত্র প্রস্তুতি গড়ে তুলুন

১৯৫৬ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছিল যৌথ আন্দোলনের মঞ্চ থেকে। পরবর্তীতে ১২ই জুলাই

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

কমিটি বা সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বারে বারেই যৌথ আন্দোলনের মঞ্চকে সম্প্রসারিত করেছে। বিগত ১১ বছরের বেশি সময় ধরে যখন বর্তমান রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক সমাজের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, সার্বিক ভাবে গোটা রাজ্যের বেকার যুবক যুবতী সহ খেটে খাওয়া মেহনতীর বিরুদ্ধে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে তখন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার অতীত ঐতিহ্যকে ধারন করেই যৌথ আন্দোলন বৃত্তকে আরও বৃহত্তর আকার দিয়ে প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের রাস্তাতেই বিরামহীন পদচারণ করছে। আন্দোলন সংগ্রামের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবনের পথ্য দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে যৌথ আন্দোলন সার্বিকভাবে

দেবব্রত রায়

রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

১০ মার্চ সর্বাত্মক সফল ধর্মঘট

অপেক্ষায় থাকা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ

এক আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করলো আমাদের রাজ্যের সরকার থেকে সমস্ত দেশবাসী । বিগত ১০ মার্চ ২০২৩ রাজ্যের কর্মচারী সমাজ তৈরি করলো সংগ্রাম-আন্দোলনের নতুন ইতিহাস। রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত

খাদ্য ভবন (কলকাতা)

শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনগুলির বৃহৎ যৌথমঞ্চ তাদের নিয়োগ কর্তার সামগ্রিক বঞ্চনা-অবজ্ঞা- আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘটালো তাদের ক্ষোভের।

অথচ হঠাৎ করেই এই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে তা তো নয়, চাকুরি জীবনের স্মরণকালের মধ্যে সেই দিনটার কথা কি আপনাদের মনে পড়ে, যখন সরকারী অফিস চত্বরে শুধুমাত্র দীর্ঘকাল বকেয়া পড়ে থাকা বিপুল অঙ্কের মহার্ঘভাতা বা শূণ্যপদে নিয়োগের মতো নায্য দাবি উচ্চারণ করার অপরাধে একটা সরকার তার পুলিশ দিয়ে তার নিজেরই কর্মচারীদের জামার কলার চেপে ধরে, গলা ধাক্কা দিয়ে, টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তুলে গ্রেপ্তার করে থানায় আটকে রাখে!! শুধু এটুকুই নয় পরের দিন প্রবল প্রতিহিংসায় সরকারের প্রধানার নির্দেশে মন্ত্রিসভার বৈঠক করে তাঁদের দূরদূরান্তে বদলী করে!! এদের অপরাধটা কি? এরা কি রাজ্য বা দেশের শত্রু? এরা কি সারদা

ধর্মঘটের পর কেন্দ্রীয় জমায়েত

দুর্নীতির মামলায় কিম্বা সন্ত্রাসবাদী বোমা মামলায় বা নিয়োগ দুর্নীতিতে

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

৩৬ টাকা করে প্রতীকী অর্থ ফেরত সরকারকে

বেজায় 'আর্থিক সঙ্কটে' রয়েছে আমাদের রাজ্যের সরকার। গলা অবধি ধার করেও সামলাতে পারছে না। নুন আনতে পান্তা ফুরনোর অবস্থা। তাই সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য মন কাঁদলেও, উপায় নেই, তাই নাকি ডিএ দিতে পারছে না। ৩৬ শতাংশ ঐ কারণেই বকেয়া রয়েছে, আর কিছু না! সরকারের সদিচ্ছার নাকি কোনো অভাব নেই!

সরকার যখন এতটাই সঙ্কটে, তখন আমরা কর্মচারী ও শিক্ষকরা চুপ করে বসে থাকি কী করে? বিশেষ করে সঙ্কটের ধাক্কায় যদি মন্ত্রীদের হরেকরকম ভাতা বন্ধ হয়ে যায়? দুধেভাতে থাকা মন্ত্রীমশাইদের বড্ড কষ্ট হবে। রাই রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আর্থিক সঙ্কটের জন্য দিতে না পারা মহার্ঘভাতার (৩৬ শতাংশ) প্রতি শতাংশের বিনিময়ে ১ টাকা করে মোট ৩৬ টাকা এপ্রিল মাসে প্রত্যেক কর্মচারী সরকারকে ফেরৎ দেবে। যাতে আমরা পাই না পাই, মন্ত্রীদের ভাতা যেন অক্ষত থাকে। আমরা কয়েক লক্ষ কর্মচারী ও শিক্ষক যদি ৩৬ টাকা করে ফেরৎ পাঠাই, মন্ত্রীমশাইরা অন্তত কয়েক মাস নিশ্চিন্তে থাকবে। □

৫ এপ্রিল মজদুর-কিষাণ সংঘর্ষ সমাবেশে কেঁপে উঠল রাজধানী

আলোচনার জন্য সাক্ষাতের সময় চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

পত্র নং ঃ কো-অর্ডি-২৭/২৩ তারিখ ঃ ১৮-০৩-২০২৩

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
নবান্ন, হাওড়া

শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া,

আপনি অবহিত আছেন যে, এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারী সহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত বিভিন্ন অংশের শ্রমিক, কর্মচারী ও শিক্ষক মহাশয়দের বিপুল পরিমাণ (এই মুহূর্তে ৩২ শতাংশ) মহার্ঘভাতা বকেয়া রয়েছে। সর্বভারতীয় ভোগ্য পণ্যের মূল্য সূচকের নিরিখে (AICPI) কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা নির্ধারিত হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে রাজ্য সরকারগুলি সেই সূচক ধরেই মহার্ঘভাতা ঘোষণা করে থাকে। সম্প্রতি, সেই সূচকের নির্ধারিত হার অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে পুনরায় ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করতে চলেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি যখন চরম সীমায় পৌঁছেছে, তখন ২০২৩-২০২৪ অর্থ বর্ষের রাজ্য বাজেটে এই খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ না করে দীর্ঘ ২ বছরের অধিক সময় পরে মাত্র ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা রাজ্যের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক মহাশয়দের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে তো পারেইনি, বরং এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের প্রতি রাজ্য সরকারের উপেক্ষার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে গত ১০ মার্চ, '২৩ প্রশাসনের অভ্যন্তরে ধর্মঘটে। ইতিপূর্বে আমরা এই বিষয়ে বহুবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। সর্বশেষ গত ৩ জানুয়ারি, ২০২৩ বকেয়া মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ প্রদানের বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দেওয়া হয়েছিল (পত্র নং ঃ কো-অর্ডি-০৪/২৩, তারিখ ঃ ০৩/০১/২০২৩)। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল আপনার দিক থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। আমরা আশা করি সেই পত্রটি আপনার নজরে আনা হয়েছে। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের কাছে, রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সর্ববৃহৎ সংগঠনের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক রীতি মেনে কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা থেকে একাধিকবার সাক্ষাৎ করার সুযোগ চাওয়া হয়েছিল। কার্যত দীর্ঘ এক দশক এই ধরনের কোনো সুযোগই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পায়নি। সামগ্রিক কর্মচারী স্বার্থে আমরা পুনরায় আপনার সাথে সাক্ষাতে দাবি উত্থাপন করতে আগ্রহী।

আশাকরি, আপনি উল্লিখিত দাবি ও সমস্যাবলী সম্পর্কে সুবিবেচনা প্রসূত আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের অবহিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

ফাগুনে আগুনের তেজ

প্রতি বছরই ফাল্গুন মাসে আমরা সবাই গুনগুনিয়ে উঠি 'বসন্ত এসে গেছে'। পাশাপাশি প্রকৃতির নিয়মে ফাল্গুনে প্রস্ফুটিত সেই আগুনরঙা পলাশের তেজ ও সৌন্দর্যে আমাদের সবার মন ভরে ওঠে এবং ঐ আগুনের তেজের

সুতপা হাজরা

মতো আমরাও তেজস্বী হয়ে উঠি। কারণ প্রতি বছর এই সময়ে আমাদের জন্য নতুন নতুন বার্তা বয়ে নিয়ে আসে একটি বিশেষ দিন, '৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস'। যদিও ইতিহাসের নিরিখে নারী দিবস বলা হয় কিন্তু পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ নারী এবং অর্ধেক নর, তাই আমরা মনে করি এই দিনটি আমাদের নারী-পুরুষ উভয়কেই নতুন তেজে তেজিয়ান করে আমাদের অধিকার অর্জনের, অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের ময়দানে প্রতি বছর একধাপ করে এগিয়ে নিয়ে যায়। হীরের ঔজ্জ্বল্যের পিছনে যেমন আছে খনির অতল থেকে তুলে আনার মর্মস্পর্শী কাহিনী, তেমনি এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাসের ঔজ্জ্বল্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, এই দিনটি আমাদের সবাইকে দৃপ্ত করার দিন, নীরবতা থেকে বাঙ্ময় হওয়ার দিন, হকের দাবি সোচ্চারে উচ্চারণ করার দিন।

প্রতি বছরই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহিলা উপসমিতির পক্ষ থেকে এই দিনটিতে বিশেষ আলোচনা সভা করা হয়ে থাকে। এ বছরের ৮ মার্চ বসন্ত উৎসবের রেশ থাকায় গত ১৭ মার্চ '২৩ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে বেলা ৩টা থেকে এই দিনটি উদ্‌যাপনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অভ্যন্তরস্থ সমস্ত সমিতির নেতা-কর্মীরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্থায়ী সহ-সভানেত্রী নিবেদিতা দাশগুপ্ত, সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যা দেবলা মুখার্জী ও রুবি সিন্‌হাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল—"সমানাধিকারের সংগ্রাম ও বর্তমান প্রেক্ষিত।" মূল আলোচক ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক আবদুল কাফী। সভার প্রথমে অধ্যাপক আবদুল কাফীকে পুষ্প স্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা প্রদান করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন

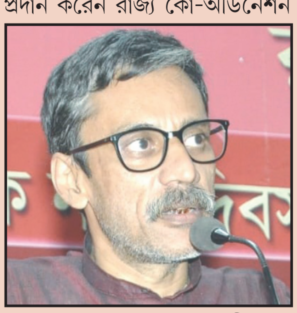

অধ্যাপক আব্দুল কাফী

কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং স্মারক হিসাবে একটি শাল দিয়ে সম্বর্ধনা প্রদান করেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা গীতা দে।

প্রারম্ভিক বক্তব্য রেখে সভার সূচনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, "প্রতি বছরই এই দিনটি উদ্‌যাপনে পরিস্থিতির নিরিখে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের উপর দাঁড়িয়ে আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। সেই হিসাবেই আজকের এই আলোচনার বিষয় নির্ধারিত হয়েছে—'সমানাধিকারের সংগ্রাম ও বর্তমান প্রেক্ষিত।' মুখ্য আলোচক এই বিষয়ে অবশ্যই আলোচনা করবেন। এই সময়ে আমরা

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

ধিক্-ধিক্-ধিক্কার

বছর কয়েক আগে রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের কুকুর, বিড়ালের সাথে তুলনা করেছিলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলেন, কারণ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী-শিক্ষকরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে লড়াই করছিলেন। ২৮ মার্চ ২০২৩ কর্মচারীদের চোর-ডাকাত বললেন। আবারও ক্ষেপে গিয়ে, কারণ অধিকার আদায়ের আন্দোলনের বৃত্তটি এই মুহূর্তে আরও বিশাল আকার নিয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন কুরুচিকর বক্তব্যের বিরুদ্ধে। শুধু এই রাজ্যের নয়, কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের নিম্নমানের বিশেষণ প্রয়োগ করেননি। কর্মচারীরা অতীতে ১৯৭৭-এর পূর্বে কংগ্রেসের সরকার ও দু'দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে প্রত্যক্ষ করেছে। প্রতিটি সরকারের বিরুদ্ধেই অধিকার ও দাবিদাওয়া নিয়ে একাধিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে। ১৯৬৬ সালে একদিনের গণছুটি ও ১৯৬৮ সালে একদিনের ধর্মঘটের মতো প্রত্যক্ষ সংগ্রামও হয়েছে। এর জন্য নানাবিধ দমনপীড়ন কর্মচারীদের উপর নেমে এসেছে। কিন্তু কর্মচারীদের কুকুর, বিড়াল, চোর, ডাকাত ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করার মতো কুৎসিত মানসিকতা কোনো মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করেননি।

রাজ্য প্রশাসন কি শুধু মন্ত্রী-আমলারা চালান? এই যে মাননীয়া কথায় কথায় রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলেন (তার পিছনে যুক্তি, তথ্য, প্রমাণ নাই বা থাকল), সেই তথাকথিত উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে বড় অংশীদার হল তার প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মচারীরা। সেই কারিগরদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষায় কথা বলছেন তা কুরুচিকর শুধু নয় রাজ্যের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিপন্থী। বামফ্রন্ট সরকারের সময় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা কর্মচারীদের সহকর্মী বলে সম্বোধন করতেন, শিক্ষক মহাশয়দের মাননীয় শিক্ষক বলে সম্বোধন করতেন। জননেতা জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা বিনয়ের সাথে সবসময়ে স্বীকার করতেন যে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের সর্ববৃহৎ অংশীদার হল সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। সরকারের সমস্যা হলে কর্মচারী সংগঠনের সাথে আলোচনা করেছে এবং এই অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি আমরাও পেয়েছি।

বর্তমান সরকারের প্রধানের এরকম বেসামাল হয়ে পড়ার পিছনে কারণ আছে। সবচেয়ে বড় কারণ হল শাসক দল এই মুহূর্তে রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত। কয়লা চুরি, গরু চুরি, বালি চুরি সহ নানা দুর্নীতির দায়ে সরকারের মন্ত্রী, বিধায়ক, মন্ত্রীর বান্ধবী সহ শাসকদলের কেষ্ট-বিষ্টুরা জেলে গেছে। ইডি, সিবিআই সঠিকভাবে তদন্ত করলে 'মাথা' ধরতে আর হয়তো বেশি সময় লাগবে না। তাই এমন একটা সময়ে শাসকদলের এবং সরকারের যিনি বা যাঁরা শীর্ষস্তরে আছেন তাঁদের হৃৎকম্প শুরু হবে এটা স্বাভাবিক। আর 'প্যানিক অ্যাটাক' হলে এরকম অসংলগ্ন, বেসামাল শব্দবৃষ্টি হওয়াটাও খুব অস্বাভাবিক নয়। আবার উল্টোদিক দিয়ে আমরা যদি একটা বাস্তব সত্যকে মেনে নি তাহলে মাননীয়ার আপাত অসংলগ্ন কথাকে কিছুটা সংলগ্নও মনে হতে পারে। একজন মানুষ সবসময় যদি তার চারপাশে চোর-ডাকাত-তোলাবাজদের ঘুরে বেড়াতে দেখেন করেন এবং তার কানে যদি সবসময় 'চোর-চোর' নামক মধুর শব্দ ধ্বনীত হয় তাহলে অজান্তেই 'চোর-ডাকাত' শব্দগুলি খুব কাছের এবং ভালো লাগার শব্দে পরিণত হয়ে যায়। তবে এতে সাতখুন মাপ হয় না, কারণ মানুষটি একজন জন প্রতিনিধি, শাসক দলের নেত্রী এবং সর্বোপরি মানুষটি পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি শিল্প সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাই মাননীয়ার ওই উক্তির তীব্র বিরোধিতা করা এবং ধিক্কার জানানো নাগরিক হিসেবেই আমাদের অবশ্য কর্তব্য। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের প্রায় সবকটি সংগঠনের আহ্বানে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ৬ এপ্রিল রাজ্যজুড়ে সফল কর্মবিরতি পালিত হয়েছে।

অন্য কিছু ঘটনাবলীও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এইরকম মিথ্যা কুৎসা করা বা গাল পারার মতো অবস্থায় আসার কারণ হতে পারে। যে কোনো স্বৈরাচারী শাসক প্রতিবাদকারীর কণ্ঠরোধ করতে প্রথমে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, তাতে কাজ না হলে আক্রমণ করে। আক্রান্ত হওয়ার পরও যখন প্রতিবাদ চলতে থাকে তখন স্বৈরাচারী শাসক তাকে রক্তাক্ত করে দমন করতে চায়। প্রথম দুটি পর্যায় আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। এই সরকার আসার পর প্রথমবার ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি যখন এই রাজ্যে সরকারী কর্মচারীরা সর্বভারতীয় ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল তখন ভয় দেখানোর জন্য আদেশনামা জারি হয়েছিল যে ধর্মঘট করলে ডাইস নন বা একদিনের বেতনকাটা শুধু নয়, সার্ভিস ব্রেক পর্যন্ত হতে পারে। তা সত্ত্বেও ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল কর্মচারীরা। তারপরও রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা একের পর এক সংগ্রাম কখনো এককভাবে, কখনো যৌথভাবে করেছে। ভয় তারা পায় না এটা সরকারের চোখে চোখ রেখে বুঝিয়ে দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে 'রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে দিন'—এই ধরনের বক্তব্যও আমরা শুনেছি। ২১ ফেব্রুয়ারি '২৩ যৌথ মঞ্চের কর্মবিরতি বা ১০ মার্চ '২৩ ধর্মঘটের ক্ষেত্রেও এরকম ভয় দেখানো আদেশনামা কাজে আসেনি। কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা মেরুদণ্ড সোজা করে কর্মসূচীকে সফল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন স্বৈরাচার শেষ কথা বলে না।

এরপর, দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বৈরাচারী ক্রোনলজিতে নেমে আসে আক্রমণ। বেতন কাটা, ডাইস নন তো আছেই, রয়েছে প্রতিহিংসামূলক বদলী। নবান্নে সচিবালয়ের ৬ জন কর্মচারীকে ১০ মার্চ ধর্মঘট করার শাস্তি হিসাবে বদলী করা হয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত ব্লকে, যেখানে এই সকল কর্মচারীদের কোনো পোস্ট নেই। নতুন নয়, এই ধরনের আক্রমণ ২০১১ সালের পর থেকে আমরা দেখছি। সর্বস্তরে বদলী শুধু নয় আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণ এবং কারাবাসের অভিজ্ঞতাও আমাদের নেতা-কর্মীদের হয়েছে। ২০১৮ সালে নবান্ন অভিযানে ১৮ জন কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করে স্বৈরাচারী সরকার ক্ষান্ত হয়নি, ১৫ জন নেতাকে দূরদূরান্তে বদলী করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো ধরনের আক্রমণ কাজে আসেনি। সব আক্রমণকে মোকাবিলা করে লড়াই করে চলেছেন রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরের কর্মচারীরা। বর্তমানে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন পাওয়া সকলকে নিয়ে তৈরি হয়েছে যৌথ মঞ্চ। রাতভর অবস্থান, বিধানসভা অভিযান, কর্মবিরতি ইত্যাদি আন্দোলন সংগ্রামের নানা ধাপ পেরিয়ে অবশেষে ১০ মার্চের ঐতিহাসিক সফল ধর্মঘট। ইতিমধ্যে যৌথ মঞ্চের সাথে যুক্ত হয়েছে অধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলনরত অপর একটি মঞ্চ। এর পাশাপাশি ক্রমশ তীব্র হচ্ছে গণ-আন্দোলন। ফলে এই মুহূর্তে সব দিকদিয়ে পর্যুদস্ত শাসক দল ও রাজ্য সরকার, তার উপর রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে সরকারের বিরুদ্ধে এমন বেনজির ঐক্য—ফলত বেসামাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এই ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা পরিকাঠামো যে দেশে দুর্বল, যাকে সেখানে স্বৈরাচারী শাসক প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করে। ইতিহাসে এই উদাহরণ একাধিক আছে। ভারতে বা পশ্চিমবঙ্গে শাসকের পক্ষে সেই ধরনের অনুকূল অবস্থা যেহেতু সম্পূর্ণ রূপে বিরাজ করছে না, তাই বুলডোজার চালাতে না পেরে শূন্যে হাত-পা ছোড়া, গাল পারা।

কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের কর্মকৌশলে কোনো বড় তফাৎ নেই। কেন্দ্রের শাসকদল যে রাজ্যগুলিতে ক্ষমতাসীন সেখানেও একই ধরনের আক্রমণ কর্মচারী-শ্রমিকদের উপর নামিয়ে আনা হচ্ছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিতে ধর্মঘটের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। ধর্মঘটীদের বরখাস্ত, নেতাদের এসমায় গ্রেপ্তার করা ইত্যাদি দমনপীড়নমূলক উদ্যোগ জারি আছে। কেন্দ্রের মোদি সরকারই বা দিদির চেয়ে কম যাবে কেন। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ফতোয়া জারি করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা কোনো প্রতিবাদ মিছিল, ধর্মঘটে অংশ নিতে পারবেন না। কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের জারি করা এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরের সচিবদের কাছে। সেখানে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীর কোনো ধরনের ধর্মঘট, গণ ক্যাজুয়াল লিভ, গো স্লো, অবস্থান ধরনা করতে পারবেন না। এমন কাজও করতে পারবেন না যা ধর্মঘটে মদত দেয়। আন্দোলনের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত স্বৈরাচারী সরকারের ঐ নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে প্রতিবাদ করলেই পরিণতি ভোগ করতে হবে। বেতন কাটা ছাড়াও যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সচিবদের বলা হয়েছে কর্মীদের এই নির্দেশের কথা জানিয়ে দিতে হবে। প্রতিবাদ সহ যে কোনো ধরনের ধর্মঘট থেকে তাঁদের বিরত রাখতে হবে। যদি ধরনা, প্রতিবাদ, ধর্মঘট হয় তাহলে কত জন সেখানে অংশ নিয়েছেন তা সেদিনই সন্ধ্যায় কর্মীবর্গ মন্ত্রককে জানাতে হবে।

ওরা ভয় পেয়েছে কমরেড। ১০ মার্চ '২৩ ধর্মঘটের আগের দিন এবং ধর্মঘটের দিন কর্মচারীদের জঙ্গী মানসিকতায় ভয় পেয়ে বর্তমানে নানা কারণে বেকায়দায় পরা এই রাজ্যের শাসক এই ধরনেরই ফতোয়া জারি করেছিল। আসলে স্বৈরাচারীরা যত ভীত হয় ততই প্রতিবাদকারীদের সন্ত্রস্ত করতে চায়। এটা স্বৈরাচারী শাসকদের পরম্পরা। কেন্দ্রের সরকার এই মুহূর্তে নানা কারণে রাজনৈতিকভাবে বেকায়দায়। তার উপর সম্প্রতি তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এবং কয়েকটি উপনির্বাচনে শাসক দল বিজেপির প্রাপ্ত ভোটে ধ্বস নেমেছে। উল্টোদিকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা পুরানো পেনশন ব্যবস্থায় ফেরত ও অষ্টম বেতন কমিশন গঠন সহ নানাবিধ দাবিতে জঙ্গী সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই ভীত সন্ত্রস্ত স্বৈরাচারী শাসকের এই আচরণ। এর প্রতিও ধিক্কার বর্ষিত হোক সর্বস্তরে।

সর্বোপরি আন্দোলন সংগ্রামকে বিপথে চালিত করতে এবং ঐক্যের বিভেদ ঘটাতে নানা ধরনের কৌশল শাসকের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়। এমনিতেই বহুমাত্রিক বিভাজনের চোরা স্রোত এই রাজ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে প্রবহমান। সম্প্রতি রাজ্যের কর্মচারী, শিক্ষক, শ্রমিকদের যৌথ আন্দোলনকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপপ্রয়াস এই রাজ্যের শাসক গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। কর্মচারী-জনগণ ঐক্য ছাড়া সংগ্রাম আন্দোলনের বৃহত্তর লক্ষ্য পূরণ হয় না। রাজ্যের শাসকের এই অপকৌশল বৃহত্তর ঐক্যে বিভাজন সৃষ্টিকারী। একই সাথে মহার্ঘভাতার অধিকার সহ অন্যান্য দাবিগুলি আদায় হলেও সুরক্ষিত থাকবে না, যদি রাজ্যের লুণ্ঠিত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না করা যায়। তার জন্য রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন প্রয়োজন। এই সমগ্র বিষয়কে প্রেক্ষাপটে এবং বিবেচনায় রেখে আসন্ন সবধরনের সংগ্রামে সামিল হতে হবে। □

৭ এপ্রিল, ২০২৩

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

ক্ষেত্রে এক রূপালী রেখার দিকনির্দেশ করছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের আহ্বান ছিল—আগামী দিনে আরও বৃহত্তর সংগ্রামে যাওয়ার সর্বত্র প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেই আহ্বানকে বাস্তবায়িত করার ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা হাজির। সর্বস্তরে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ সহ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ আজ আর্থিকভাবে নজিরবিহীন আক্রমণের শিকার। দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার, দেশের সংবিধান আক্রান্ত। তাই এই অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে সর্বত্র আন্দোলন জারি রাখতে হবে। আক্রমণের পাল্টা প্রতিরোধ-প্রত্যাঘাতে যেতে হবে। অদম্য সাহস, আত্মত্যাগ, চেতনাসম্পন্ন দুর্নিবার মনোবল নিয়েই ধারাবাহিক সংগ্রাম-আন্দোলন লড়াইয়ে যুক্ত হতে হবে। রাজ্য সম্মেলনের এই উদাত্ত আহ্বানকে ধারণ করেই আমরা ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারি সামিল হয়েছিলাম বিধানসভা অভিযান কর্মসূচীতে। অবরুদ্ধ হয়েছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে কর্পোরেশন ভবন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রাজপথ। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্টীলের ব্যারিকেড করে আটকানো হয়েছিল সুবিশাল মিছিলকে। এমনকি ব্যারিকেডের ওপরে রাখা ছিল টিয়ার গ্যাস, জলকামানও। সেখানেই সংক্ষিপ্ত সভা থেকে ঘোষিত হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারি গোটা রাজ্যব্যাপী দপ্তরে দপ্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালিত হবে একদিনের কর্মবিরতি, তিন দফা দাবির ভিত্তিতে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে ভয় দেখানোর জন্য কালা আদেশনামা জারী হলেও, তাকে উড়িয়ে দিয়ে সারাদিন ধরে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ জানানোর মধ্য দিয়ে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা তাঁদের প্রতিবাদকে প্রত্যাঘাতের স্তরে নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারী জানিয়েছিলেন। আন্দোলনের এই তরঙ্গশীর্ষ থেকেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে যৌথ মঞ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১০ মার্চ ২০২৩, রাজ্য প্রশাসনকে স্তব্ধ করে পালিত হবে ধর্মঘট। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দীর্ঘ ইতিহাসে ১০ মার্চ তিন দফা দাবির ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট হবে শুধুমাত্র নিজক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ধর্মঘট। ১৯৬৮ সালের ১৬ মে আট দফা দাবির ভিত্তিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রথমবার ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। সেই সময়ও পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল, কিন্তু দীর্ঘ ৫৫ বছর আগের ধর্মঘট ও ১০ মার্চ-এর ধর্মঘটের দাবিগুলির মর্মবস্তু একই অর্জিত অধিকার রক্ষা। আমাদের পূর্বসূরীরা প্রথমবার ঐতিহাসিক ধর্মঘটে হিম্মত দেখিয়ে প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন কোনোরকম অধিকার তা সে ধর্মঘট করাই হোক বা লড়াই আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করাই হোক তা প্রায় না থাকা সত্ত্বেও। দীর্ঘ ৩৪ বছর বামফ্রন্ট সরকার থাকার মধ্য দিয়ে কর্মচারীরা অর্জন করেছিল বহু অনাদায়ী দাবি। একই সঙ্গে সার্ভিস রুলে স্বীকৃত হয়েছিল ধর্মঘট সহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার। ২০১১ সালে রাজ্যের সরকার পরিবর্তনের পরবর্তীতে কর্মচারীদের অর্জিত অধিকারগুলিই আজ প্রশ্নচিহ্নের সামনে। অর্জিত অধিকার রক্ষার্থে, বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১০ মার্চ, ২০২৩ প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার সর্বোচ্চ সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে কর্মচারী সমাজকে প্রস্তুত করতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন পরবর্তীতে প্রথম রাজ্য কাউন্সিল সভায় প্রস্তাবক থেকে সমস্ত আলোচক হয়ে জবাবী বক্তব্য সহ সভাপতিমণ্ডলীর বক্তব্যের মধ্য দিয়েও এই মূল আহ্বানই ধ্বনিত হল।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমির্টির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী প্রথম রাজ্য কাউন্সিল সভা বিগত ৪-৫ মার্চ ২০২৩ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ মার্চ বিকাল ৪ ঘটিকায় সভা শুরু হয়। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মানস দাস ও সহ-সভাপতি ত্রয় প্রশান্ত সাহা, রবীন্দ্রনাথ সিংহরায় ও নিবেদিতা দাশগুপ্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক শোকপ্রস্তাব উত্থাপন ও নীরবতা পালনের পরবর্তীতে উপস্থিত রাজ্য কাউন্সিল সদস্যদের সামনে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করতে গিয়ে নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিদিনের ক্যালেন্ডার হবে আন্দোলন কর্মসূচীর। প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধ, প্রতিরোধ থেকে প্রত্যাঘাত-এ যেতে হবে। পরিস্থিতির পরিবর্তন যতক্ষণ না ঘটাতে পারছি ততক্ষণ শুধুমাত্র দর্শক হিসাবে নয়, প্রকৃত খেলোয়াড়ের ভূমিকাও গ্রহণ করতে হবে।

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন বর্তমান আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যের জটিল ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে বহুবিধ আক্রমণের মুখে রাজ্য সম্মেলন সার্বিকভাবে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভ্যর্থনা কমিটির পরিকল্পিত বহুমাত্রিক উদ্যোগ এবং দীর্ঘ আট মাস ধরে প্রচার পরিকল্পনায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অদ্ভুত মিশেল ঘটেছে। জলপাইগুড়ি জেলায় রাজ্য সম্মেলন অন্তর্বস্তু ও বহিরঙ্গ উভয়তই এক প্রেরণাদায়ক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিনিধিদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন জেলা, সমিতির পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা কমিটিকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। রাজ্য সম্মেলন মঞ্চে প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তীতে বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ উপসমিতি গঠন করা হয়েছে সংগঠনের সার্বিক কর্মকাণ্ড, কর্মসূচী রূপায়ন ও দৈনন্দিন কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষ্যে। বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ নভেম্বর, ২০২২ বিধানসভা অভিযান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী মিথ্যা মামলায় যুক্ত ৪৭ জনকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজিরার দিন কোর্টে কর্মচারীদের জমায়েত এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ১০ জানুয়ারি '২৩ রাজ্যের সর্বত্র টিফিনের সময় বিক্ষোভ সভা হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিজি প্রেস-র আলিপুর ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে টিফিনের সময় 'শিল্প সদন'-এর সামনে বিক্ষোভ সভা হয়। ৮ ডিসেম্বর ২০২২ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জাতীয় কনভেনশনের সিদ্ধান্তক্রমে ৭ দফা দাবিতে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রাজ্য কনভেনশন সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে অনুষ্ঠিত হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে জনস্বার্থের পরিপন্থী কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে সারা রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে জাতীয় মহিলা কনভেনশনে ১০ জন মহিলা প্রতিনিধি জয়পুরে উপস্থিত ছিলেন। (২৮-২৯ জানুয়ারি ২০২৩)। একইভাবে চণ্ডীগড়ে ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সর্বভারতীয় সংগঠনের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সমাপ্তি সভা জলপাইগুড়ি জেলায় কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিধানসভা অভিযান ও রাজ্যপালের নিকট স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচীকে সফল করতে ১৩-১৬ ফেব্রুয়ারি লিফলেট বিতরণ, গেট সভা, পথ সভা, ট্যাবলো ইত্যাদি প্রচারমূলক কর্মসূচী সারা রাজ্যব্যাপী করা হয়। ফলস্বরূপ ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রাজপথ জনজোয়ারে পরিণত হয়, জেলায় জেলায় জেলাশাসকদের নিকট স্মারকলিপি প্রদান ও ২ ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচী বিপুল জমায়েতের মধ্য দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চের আহ্বানে ৩ দফা দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি 'সারাদিনব্যাপী কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ সভা, কর্মসূচীর সমর্থনে প্রচারমূলক কর্মসূচী হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মবিরতি ও বিক্ষোভসভায় সারা রাজ্যব্যাপী সম্মিলিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কর্মবিরতি ও

● চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য

সব দ্বিধা সরিয়ে নির্ভয়ে সংগ্রামের পথেই থাকুন

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন। বিগত ২০১৩ সালের যে সম্মেলনে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম, সেই সময়কার অবস্থার থেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধিদের বক্তব্য ও আচরণ অনেক বেশি ভয়শূন্য ও সাহসী। যা দেখে আমি আনন্দিত এবং গর্ব অনুভব করছি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের উত্তরসূরী এই রাজ্যের কর্মচারীরা তাদের শৃঙ্খলার দ্বারা আমায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের দ্বিতীয় এন ডি এ সরকারের প্রকৃত চালক অসলে আর এস এস, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি নিয়ন্ত্রিত নয়া উদারবাদ এরা কঠোরভাবে দেশে কায়েম করতে চাইছে। সাম্প্রদায়িকতা ও কর্পোরেটের এক সুচারু মেলবন্ধন আমরা প্রত্যক্ষ করছি। দেশের কৃষক, শ্রমিক ও আমজনতা মিলে যে রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলো তৈরি করেছিলেন বিগত ১০ বছর ধরে, এই সরকার জলের দরে সেগুলো বন্ধুস্থানীয় পুঁজিপতিদের বিক্রি করে দিচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদগুলিও লুঠ করে নেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আসলে এদের মূল নীতি হল বৃহৎ পুঁজিপতিদের কর ছাড় ও শ্রমজীবী মানুষের উপর অধিক কর চাপানো। সামাজিক সুরক্ষা হিসাবে ভর্তুকি প্রদান ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এদের নিশানায় আছে সংবিধান ও সাংবিধানিক সংস্থাগুলোকে ভেঙে ফেলা। আপনারা দেখেছেন কোভিড-১৯-কে প্রতিহত করতে পেরেছে সেইসব দেশ যাদের রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্র যথেষ্ট মজবুত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক এবং সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেসরকারী হাতে থাকার কারণে কোভিডে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অর্থ ও সমরাস্ত্র কোনো কাজে লাগেনি।

আমাদের দেশে ১৯৯০ পরবর্তীতে নয়া উদারবাদী নীতির প্রয়োগের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র, যুব, শ্রমিক কর্মচারী সকলে সম্মিলিত ভাবে আন্দোলন করেছি, বিরোধিতা করেছি, ধর্মঘট করেছি। অনেকেই বলেন বছরে দু-তিন দিন ধর্মঘট করে কী লাভ? আমরা তাদের বলতে চাই, রাষ্ট্রীয় সম্পদের বেসরকারীকরণ আমরা বন্ধ করতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু স্পীড ব্রেকারের ভূমিকা পালন করছি। যার ফলস্বরূপ আমরা দেখলাম কোভিডের সময় যখন সন্তান পিতামাতাকে স্পর্শ করছে না, ভাই-বোনকে স্পর্শ করছে না, তখন দেশের বিরাট সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মীরা বিনা সুরক্ষা সরঞ্জামে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করে রোগীদের পরিচর্যা করেছেন। এই সম্মেলনে তাঁরা অনেকেই উপস্থিত আছেন। ফলে যারা বেসরকারীকরণের সপক্ষে গলা ফাটাচ্ছিলেন সাধারণ জনগণের মতো তারাও বলতে বাধ্য হয়েছেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণ না হওয়ার ফলে আমাদের দেশে কোভিডে মৃত্যুহার অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম। উচিত ছিল কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকারগুলির বেসরকারীকরণের উদ্যোগকে রদ করে রাষ্ট্রীয়করণের নীতিগুলিকে আরও মজবুত ভাবে রূপায়ণ করা। কিন্তু দেখা গেল পরবর্তী বাজেটে সরকার ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন যোজনার মাধ্যমে এক বছরে দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদ হস্তান্তরিত করে ৬ লক্ষ কোটি টাকা উপার্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করল। প্রধানমন্ত্রী বললেন সরকারের কাজ ব্যবসা করা নয়। কিন্তু কার্যত সব কিছু নিয়েই ব্যবসা করার পথ খুলে দিচ্ছেন। যা আমাদের দেশের ওয়েলফেয়ার স্টেটের ধারণার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। প্রধানমন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি কোনো মূল্যেই দেশকে বেচেতে দেবেন না, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল রেল, ভেল, বন্দর, এয়ারপোর্ট, ব্যাঙ্ক, বীমা সমস্ত ক্ষেত্রকেই দ্রুত বেসরকারীকরণ করতে লাগলেন। নিয়মিত কর্মসংস্থানের বদলে Fixed term Employment চালু করলেন। দেশের সেনাবাহিনীতে অগ্নিপথ প্রকল্পে চার বছরের জন্য সেনা নিয়োগ করা হচ্ছে যেখানে ছেলে বাবার আগে অবসর গ্রহণ করবে, দিনে ৮ ঘন্টা কাজ করার পরিবর্তন সপ্তাহে ১০০ ঘন্টা করে কাজ করানো হচ্ছে কর্মচারীদের। কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে চুক্তির মাধ্যমে যাতে শর্ত রাখা হচ্ছে তারা কখনোই সমকাজে সম বেতন পাবেন না। দেশে ৬০ লক্ষ শূন্যপদ আছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলিয়ে। আপনাদের রাজ্যে ২০১১ পরবর্তীতে শূন্যপদে নিয়োগ হয়নি বললেই চলে। পরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু রেজাল্ট বেরোয়নি। 40-50% অংশ বর্তমান প্রশাসনে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, ২০২৫ নাগাদ চুক্তির কর্মচারীর সংখ্যা নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যাকে পেরিয়ে যাবে। আপনারা যখন অবসর গ্রহণ করবেন আপনাদের পোস্টও অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এদিকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালে ঘোষণা করেছিল প্রতিবছর ২ কোটি কর্মসংস্থান হবে। আজকে ৯ বছর পর যেখানে ১৮ কোটি কর্মসংস্থান হওয়ার কথা ছিল, সেখানে লোকসভা অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে সরকার জানায় চাকরি পেয়েছেন ৭ লক্ষ ১০ হাজার জন। আরও ১০ লক্ষ পাবেন। এই ১৭ লক্ষের হিসাবও অদ্ভুত। দিল্লীর আশেপাশে ডিজেলচালিত ট্রাক ১০-১৫ বছরের মধ্যেকার সময়ে বন্ধ করে নতুন ট্রাক নেওয়া হচ্ছে—এই নতুন ড্রাইভার, নতুন অটোরিকশা রাস্তায় নামলে সেই চালক এবং তিন-চার মাসের জন্য কাজ পাওয়া কোনো কর্মচারীকেও এই ১৭ লাখের মধ্যে গোনা হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি চূড়ান্ত সীমায়, কিন্তু অর্থমন্ত্রী বলছেন মূল্যবৃদ্ধি হয়নি। সেখানে মূল্যবৃদ্ধির সীমা ৬ শতাংশ পেরিয়ে গেলেই তা বিপজ্জনক ধরা হয়। সেখানে বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ পেরিয়ে গেছে যা ভয়ঙ্কর। দরিদ্র মানুষের রুজি-রুটির সঙ্কট বাড়ছে। এমনিতেই কোভিডের পর আমদানি কমেছে, মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ব্যাপক। বিশেষত খাদ্যদ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে সর্বাধিক। শাকসবজির দাম বেড়েছে ১৭ শতাংশ। এদিকে কোভিডকালে গৌতম আদানির সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে ৭৫০ শতাংশ। ২০২১-এ কোভিডের সময়কালে গৌতম আদানির প্রতিদিনের আয় ছিল ১০০৪ কোটি টাকা। যখন দেশে ১৪ কোটি লোক কাজ হারিয়েছে। এভাবেই গৌতম আদানি বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। করোনাকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রীয় সরকার ১৮ মাসের ডি.এ ফ্রিজ করে দিয়েছে। নিয়মিত কর্মচারীদের নিয়োগ করা হচ্ছে না—কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে এদের পুরো বেতন ও পেনশন দিতে হয়—ঐ টাকায় তিনজন অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়োগ করা যায়। পেট্রোল, ডিজেলের উপর প্রায় ৬০ শতাংশ ট্যাক্স লাগানো হয়েছে। এই ট্যাক্স কমালে সাধারণ

সুভাষ লাম্বা
(সভাপতি, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন)

মানুষের একটু সুরাহা হতে পারত, কিন্তু সরকারের যুক্তি ট্যাক্স কমালে দেশের অর্থব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাবে। রান্নার গ্যাস বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে জনগণকে। দেশের উন্নতির স্বার্থে এই উপদেশ বিতরণ হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা কি সত্যিই তাই। আপনি কারো পকেটমারি করতে চাইলে তার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিন। লোকসভার বর্তমান শীতকালীন অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন বৃহৎ পুঁজিপতিদের ১১.৬৭ লক্ষ কোটি টাকা মকুব করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি কৃষকদের ঋণমকুবের কথা বলি তাতে সরকার নারাজ। যখন মোদী সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, তখন কর্পোরেট ট্যাক্স ছিল ৩০ শতাংশ। যা কমিয়ে বর্তমানে ২২ শতাংশ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর

১.৫ লক্ষ কোটি টাকা কর্পোরেটদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে বিভিন্ন পুঁজিপতি ৩৪ হাজার কোটি টাকা লোন নিয়ে পালিয়ে গেছে—তারাই নির্বাচনে বিজেপি দলকে ২৯ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, মিত্রোঁ... না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা। আর বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোকসি সহ ৫০ জন ৬৮,৬০০ কোটি টাকা নিয়ে দেশের বাইরে ফেরার হয়ে গেছে। শুধুমাত্র আদানিদেরই ৭২ হাজার কোটি টাকা ঋণ ছাড় দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় আদানিদের একটা কয়লাখনি লোকসানে চলছিল। দেশের বিদ্যুৎ দপ্তরের নির্দেশক্রমে ১৬৭০০ টাকা টন দামে ওই খনি থেকে কয়লা আমদানি করা হচ্ছে, যেখানে দেশীয় কয়লার মূল্য টন প্রতি ২৬০০ টাকা। দেশে কয়লার উৎপাদন যেখানে প্রয়োজনের চেয়ে অধিক সেখানে উচ্চমূল্যে কয়লা কেন কেনা হচ্ছে লোকসভা অধিবেশনে প্রশ্ন করায় এ অর্ডার বাতিল করা হয়েছে। দেশজুড়ে লুটের রাজত্ব চলছে। অত্যাবশ্যকীয় প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রীর উপর চড়া হারে জি এস টি লাগু করা হয়েছে। বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর জন্য চিন্তায় দিনে মাত্র ৪ ঘন্টা ঘুমোচ্ছেন। আমরা বলতে চাই মোদিজী আরও ৮-১০ ঘন্টা ঘুমান—তাহলে অন্তত দেশের অবশিষ্ট সম্পদ বিক্রি হওয়া থেকে রেহাই পাবে। এই সময়ে সর্বাত্মক আক্রমণ নেমে এসেছে দেশের সংবিধানের উপর। আর এস এস-এর জন্ম ১৯২৫-এর সেপ্টেম্বরে। যদি এরা ২০২৪-এ তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় আসে তবে দেশকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে দেবে—সে দেশ চলবে সংবিধানের উপর নির্ভর করে নয়, মনুসংহিতার উপর নির্ভর করে। সাংবিধানিক পদগুলিতে নিজেদের লোক বসানো হচ্ছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পুরনো দু'জন গভর্নর রঘুরাম রাজন এবং উর্জিত প্যাটেল যারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফান্ডের টাকা ট্রান্সফার করার বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের সরিয়ে একজন ইতিহাসবিদকে ঐ পদে রাখা হয়েছে যাতে আর এস এস-এর কথা মান্যতা পায়। ইউ পি এস সি পরীক্ষা দিয়ে আসা আই এ এস-দের সরিয়ে নতুন পদ তৈরি করে তাতেও নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ই ডি, সি বি আই ও নির্বাচন কমিশনকেও ব্যবহার করা হচ্ছে নিজেদের ইচ্ছেমতো।

বিগত লোকসভা নির্বাচনে পুলওয়ামার ঘটনা বি জে পির আই টি দ্বারা যেভাবে প্রচারিত হয়েছে, নির্বাচন কমিশন ঠিক সেভাবেই প্রেস কনফারেন্স করেছে। আদালতকেও নিজেদের কব্জায় এনে ফেলেছে এরা। এখন ইলেক্টোরাল বন্ড যা এস বি আই-এর মাধ্যমে দেওয়া যায় তাতে দাতা এবং গ্রহীতার নাম কাউকে বলার প্রয়োজন নেই। ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে গৃহীত অর্থের ৯০ শতাংশই বিজেপি-র যা তারা যে কোনো নির্বাচিত সরকার ভেঙে ফেলার জন্য এবং নির্বাচনী খরচে জলের মতো ব্যবহার করছে। দেশের প্রতিটি রাজ্যের জেলা দপ্তর সহ কেন্দ্রীয়ভাবে দিল্লীতে পেল্লায় পার্টি অফিস তৈরি করা হচ্ছে। সি এ এ, এনআরসি ও আর্টিকেল ৩৭০ ৩৫(এ) নিয়ে একাধিক মামলা করা হয়েছে কিন্তু আদালত সময় বের করে এগুলির শুনানি করছে না। কিন্তু বিজেপি নেতা-নেত্রীরা অ্যারেস্ট হলে রাতে আদালত খুলে তাদের জামিন করে দেওয়া হয়। ৪৪টা শ্রম আইন ভেঙে ফেলে শ্রম কোডের প্রবর্তন করা হয়েছে—যার ফলে আগামী দিনে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, মালিকের সঙ্গে দর কষাকষি শেষ হবার মুখে। দিল্লীর যন্তরমন্তর-এ ১০০০-এর বেশি লোকের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এদের নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুললেই তাকে দেশদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হচ্ছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল তাদের অনুগামীদের দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সারা দেশে কর্পোরেট মিডিয়াগুলো ২৪ ঘন্টা সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে যাচ্ছে। এনডি টিভি যে চ্যানেল সত্যি খবর প্রকাশ করত, তাদেরকেও গৌতম আদানি কিনে নিয়েছে। সাম্প্রদায়িকার বিষবাষ্প দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০০২-এ গুজরাট দাঙ্গা যেখানে বিলকিস বানু গণধর্ষিতা হন এবং পরিবারের ১৪ জনকে হত্যা করা হয়। দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে "আজাদী কা অমৃত মহোৎসব" পালনের দিন ১৫ আগস্ট বিলকিস বানুর ধর্ষকরা মুক্তি পায়। মনিষা বাল্মীকী হাথরাসের দলিত মেয়েটিও গণধর্ষণের শিকার হয়।

নারীদের উপর এই আক্রমণ মুসলমান বা দলিত বলে নয়—যে কারোর উপর এই আক্রমণ নেমে আসতে পারে। ধর্ষকদের সপক্ষে মিছিলও আমাদের বাকরুদ্ধ করে। দেশের জি ডি পি কমছে, ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য কমছে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী বলছে টাকার মূল্য কমছে না, ডলার শক্তিশালী হচ্ছে। জি এস টি চালু করা, নোটবন্দী করা এসবের পর বলা হল দেশের সমস্ত কালো টাকা ফেরত আসবে—কিন্তু কিছু হয়নি। এই সঙ্কটকালীন পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে আমরা কী করব। এদের কাছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া ও সরকারের পয়সা আছে। আমাদের আছে লড়াই করার শক্তি। উদাহরণস্বরূপ দেখুন উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার 'এসমা' লাগু করেছে কর্মচারীদের উপর। ওখানে কর্মচারীরা লড়াই আন্দোলন করলে তাদের গ্রেপ্তার হতে হয়, পরবর্তীতে ছাড়া পান। ছত্তিশগড়ে কর্মচরীরা বকেয়া মহার্ঘভাতার জন্য আধিকারিক সহ সকলেই টানা ৮ দিন ধর্মঘট করেছেন— তারপর সরকার দিতে বাধ্য হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে কর্মচারীদের গভর্নর সরাসরি বরখাস্ত করতে পারছেন কোনো শোকজ নোটিশ ছাড়াই—শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদী যোগাযোগের অনুমানের উপর ভিত্তি করে।

হরিয়ানার বিজেপি সরকার সার্কুলার জারি করে কর্মচারীদের লড়াই আন্দোলনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, কিন্তু কর্মচারীরা ঐ কালা সার্কুলার পুড়িয়ে বিশাল জনসমাবেশের মধ্যে দিয়ে সরকারকে ঐ সার্কুলার ফেরত নিতে বাধ্য করে। ত্রিপুরাতে বি জে পি সরকার এসেই পুরোনো পেনশন তুলে দিয়ে নয়া পেনশন প্রকল্প চালু করে। মিসড্ কলে চাকরি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে নতুন করে চাকরি দেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে এই সরকার। মণিপুর, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্যেও কর্মচারীরা লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের রাজ্যের তৃণমূল সরকারের সঙ্গে বিজেপি সরকারের কোনো পার্থক্য নেই। অনেকেই মনে করেন তৃণমূলের বিকল্প বি জে পি—এটা ২ শতাংশ লোক ভাবলেও এটা পরিষ্কার জেনে রাখুন বি জে পি এবং টি এম সি-র বিকল্প বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। কেরালায় বাম সরকারকে দেখুন, ৯০ শতাংশ শিশু সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ে, বেশিরভাগ মানুষ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করান এবং ৩০ দিনের মধ্যে শূন্যপদ পূরণ না হলে পিএসসি কর্তৃপক্ষকে চার্জশীট প্রদান করা হয়। টি এম সি-র থেকে বি জে পি ভয়ঙ্কর ধর্ম ও জাতের নামে এরা এমন লড়িয়ে দেবে পরস্পরকে দাবি দাওয়ার আন্দোলন ভুলে যেতে হবে। এখানে ৩৫ শতাংশ ডি এ বাকি। হাইকোর্ট বলছে দিতে হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার প্রচুর পয়সা খরচ করে এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেছে। আমাদের পেনশনার্স বন্ধুরা শুধুমাত্র এর উপরেই দিনগুজরান করেন। এদের অবস্থা কী করুণ—তবুও লজ্জা নেই মুখ্যমন্ত্রীর। সাড়ে ৫ লক্ষ শূন্যপদ, কর্মসংস্থানহীনতা চূড়ান্ত সীমায়—সেখানে অযোগ্য লোকেদের পিছনের দরজা দিয়ে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। এখানে প্রায় ২ লক্ষ চুক্তির কর্মচারী আছেন। ওদের চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই, ওরা সরকারের গোলাম। যদি এরা সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে তাহলে চাকরি খোয়ানোর ভয় আছে। বাড়ি ভাড়া ভাতা এখানে ১২ শতাংশ। এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ফলে ২৩ নভেম্বর ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আন্দোলনকারীকে বদলী করে দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক দার্জিলিং থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। আমরা একটা জিনিস অনুভব করেছি—যদি আমরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাই শেষে একটা দেওয়ালে ধাক্কা খাব। মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন সামনে নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে বান নিক্ষেপ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন সামনে যাদের দেখছ, তারা তোমার শত্রু—তাদের পরাজিত করাই তোমার কাজ। পরবর্তীতে ভীষ্ম সহ

● দশম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

✖ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

বিক্ষোভসভায় বিভিন্ন জেলায় কর্মচারীদের ওপর আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি ধিক্কার দিবসের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়।

আগামী কর্মসূচী বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি '২০২৩ সারাদিনব্যাপী কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ সভার কর্মসূচীতে সারা রাজ্যের কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও লড়াকু মেজাজের প্রতিফলন ঘটেছে। রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন শক্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই সংগ্রামে চেতনাকে ধারন করে বৃহত্তর সংগ্রামে যাওয়ার লক্ষ্যে আগামী ১০ মার্চ '২০২৩ রাজ্যের সর্বত্র প্রশাসনিক দপ্তরে ধর্মঘটে যাওয়ার যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জরুরি পরিষেবা এবং বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যতীত সর্বত্র সফল ধর্মঘট করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ১০ মার্চ ধর্মঘটের দিন সকল কর্মচারীদের নিয়ে বিকাল ৪টায় জেলাস্তরে মিছিল করতে হবে। কলকাতায় প্রেস ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স করে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৭ দফা দাবিতে রাজ্য কনভেনশনের ভিত্তিতে আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২৩-এর মধ্যে জেলাস্তরে কনভেনশন করতে হবে। সর্বভারতীয় সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭ দফা দাবিতে আগামী ১৪ মার্চ ২০২৩ টিফিনের সময় ধর্ণা কর্মসূচী রূপায়ন করতে হবে। আগামী ৫ এপ্রিল শ্রমিক-কৃষক আহুত 'সংসদ অভিযান' কর্মসূচীতে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের আহ্বানে দিল্লীর ঐতিহাসিক জমায়েতে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপস্থিত সুনিশ্চিত করতে হবে। আগামী ১৭-২০ এপ্রিল ২০২৩ রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ব্লক কমিটিগুলিকে সক্রিয় করা এবং কর্মচারীদের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যেই ব্লক স্তরে কেন্দ্রীয় সফরসূচী হবে। জেলা নেতৃত্বকে পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'-এর কর্মসূচী সম্পন্ন করতে হবে। আলোচনার বিষয় 'সমানাধিকারের সংগ্রাম ও বর্তমান প্রেক্ষিত'। কেন্দ্রীয় কর্মসূচী আগামী ১৭ মার্চ, ২০২৩ অরবিন্দ সভাকক্ষে বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক আব্দুল কাফি, সর্বভারতীয় সংগঠনের আহ্বানে এপ্রিল-মে ২০২৩-এর মধ্যে ব্লক স্তর পর্যন্ত দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদে ভেহিক্যাল জাঠা সহ মিছিল ও সমাবেশ করতে হবে। 'অর্জিত অধিকার রক্ষায় ঐক্য ও সংগ্রাম'—এই আলোচনার বিষয়কে সামনে রেখে ১ মে ২০২৩ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস-এর কর্মসূচী যথাযথ মর্যাদায় পলন করতে হবে। ''কর্পোরেট হিন্দুত্ববাদী গেমপ্ল্যান বনাম ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র'' এই নির্দিষ্ট বিষয়কে সামনে রেখে আগামী দিনে মতাদর্শগত সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবির জেলা ও কেন্দ্রে সংগঠিত করতে হবে। সাংগঠনিক করণীয় বিষয়ে তিনি বলেন, 'সদস্য সংগ্রহ অভিযান ২০২৩' সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর সহ যে সমস্ত দপ্তরে নতুন কর্মচারী যোগদান করেছেন, সে সব দপ্তরে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সদস্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ সহ নেতৃত্বকে কর্মচারীর কাছে দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছাতে হবে এবং আগামী মে ২০২৩-এর মধ্যে সমিতির সদস্যপদ নবীকরণের কাজ সমাপ্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। সংগ্রামী হাতিয়ার ও এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহকভুক্তি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব, কর্মী কর্মচারী, যারা চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করছেন তাদের নামের তালিকা পেনশনার্স সমিতির কাছে প্রেরণ করতে হবে। গ্রামীন স্তরে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সর্বত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। অভিজ্ঞতার নিরিখে গ্রামের মানুষ অবাধ-সুষ্ঠ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। প্রচারমূলক কর্মসূচী হিসাবে ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্বে বহুবিধ কর্মসূচীর পাশাপাশি পথনাটক, তর্জা গান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর জন্য টিম গঠন করে প্রচারে যুক্ত হতে হবে। আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামকে সামনে রেখে আগামী ১৭ মার্চ, ২০২৩ সমিতির সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও মুখপত্রের সম্পাদকদের নিয়ে 'মুখপত্র গাইড লাইন' সংক্রান্ত সভা অফিস ছুটির পর অনুষ্ঠিত হবে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার পরবর্তীতে ২১টি জেলা কলকাতার ৬টি অঞ্চল এবং ৪টি সহযোগী সমিতির পক্ষ থেকে তাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করা হয়। সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নবনির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায় বলেন, জলপাইগুড়ি জেলা রাজ্য সম্মেলনে যে আঙ্গিক, স্পিরিট তৈরি করেছে তাকে আমরা কুর্নীশ জানাচ্ছি। আধুনিকতার ছোয়া, তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কর্মচারী সমাজের মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে এক নজির সৃষ্টি করেছে। গোটা রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে অভ্যর্থনা কমিটির কর্মকাণ্ড নতুন পথ তৈরি করেছে, নতুন সাহস জুগিয়েছে। রাজ্য সম্মেলনে পরিবারকে যুক্ত করা হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি অভ্যর্থনা কমিটির সমাপ্তি সভায় পরিবার সহ পরিবারের শিশুরা যুক্ত হয়েছে। সংগঠনের সর্বস্তরে নতুন চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন নতুন দিশা দেখিয়েছে। এ সময়কালে সংগঠনের সাফল্যের ক্ষতিয়ান দীর্ঘ, আন্দোলন সংগ্রামে ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১২ই জুলাই কমিটির কর্মসূচী গোটা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নাড়া দিয়েছে। গোটা দেশজুড়ে যে আক্রমণ একে প্রতিহত করতে রাস্তাই হোক রাস্তা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ছাড়া লড়াইয়ের ময়দানে লাগাতার আর কেউ নেই। কোনো আন্দোলনই বৃথা হয়নি। শ্রেণী ঐক্যকে আমরা মজবুত করতে চাইছি। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্নে, শ্রমিক কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্নে নানা ধরনের উস্কানি আসছে, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কৌশল নিয়ে চলতে হবে। এ লড়াই আমরাই শুরু করেছি, আমরাই শেষ করব। ব্লক সফরের প্রস্তাবনা হয়েছে। কমিটি ফাংশানিং, পুনর্গঠন / পুর্ননির্মাণের প্রশ্নে নিয়মত সভা ও তাতে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন, মানুষের সরকার যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার জন্য যা যা দায়িত আমাদের সাধারণ মানুষ হিসাবে, একজন কর্মচারী হিসাবে, একজন কর্মী-নেতৃত্ব হিসাবে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। সদস্য সংগ্রহ অভিযানকে গুরুত্ব দিয়ে শ্রেষ্ঠ জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। Reach-Unreach একই সঙ্গে Reach to Each, এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন গ্রহণযোগ্যতা। প্রশাসনের অভ্যন্তরে, কর্মচারীর অভ্যন্তরে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা প্রতিপালন করতে হবে। রাজ্যের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্র সহ বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দুর্নীতির বিষয় সামনে আসছে তাই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটছে। বিগত বছরের তুলনায় ৪ লক্ষ কম পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। দেশের ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকা গায়ে জুড়ে কর্পোরেট লুট চলছে। 'প্রতারকের শেষ অস্ত্র জাতীয়তাবাদ' স্যামুয়েল জনসন-এর উক্তি আবার প্রমাণিত। সাম্প্রতিক হিডেনবার্গ রিপোর্ট যার মধ্য দিয়ে আবার সামনে আসল এল আই সি, জাতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে সঞ্চিত সাধারণ মানুষের অর্থ কিভাবে লুঠ হয়ে যাচ্ছে। কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি আদায় করলেন, কিন্তু নির্বাচনে প্রতিফলন ঘটছে না। বাধা সাম্প্রদায়িকতা, বাধা হিন্দুত্ববাদ, Nexus। কর্পোরেট ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইতে যোগ্য ভূমিকা প্রতিপালন করতে হবে। আগামী ৫ এপ্রিল ২০২৩ পার্লামেন্ট অভিযানে আমাদের সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে। শত্রুকে চিহ্নিত করে আক্রমণের বহুমাত্রিকতাকে দূরে সরিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচীতে যেতে হবে। নিজ আদর্শ, শ্রেণীর প্রতি মমতবোধকে অটুট রেখে ঐক্যকে যতটা প্রসারিত করে এগোনো যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। চোখে চোখ রেখে সংগ্রাম লড়াইয়ের সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা প্রস্তুত করেছি। মোটিভেশন যা তৈরি হয়েছে একে রক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া, এক্ষেত্রে সতর্কতা রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে সমস্ত মাধ্যমকে ব্যবহার করতে হবে। বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বকেয়া ৩৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান, শূন্যপদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ, চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সুযোগ-সুবিধা প্রদান, প্রশাসনের অভ্যন্তরে পাঁচ লক্ষাধিক শূন্যপদ পূরণ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে তাৎক্ষণিক কর্মসূচী নেওয়ার লক্ষ্যে সর্বত্র প্রস্তুত থাকতে হবে। এছাড়া রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিপদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগতভাবে ধারাবাহিক সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। পাশাপাশি আর্থিক ও অধিকারগত বঞ্চনার বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলনকে প্রসারিত করে সমস্ত ধরনের বিভ্রান্তি কাটিয়ে লক্ষ্যে স্থির থেকে বৃহত্তর কর্মচারী সমাজকে যুক্ত করে আগামী ১০ মার্চ, ২০২৩ সর্বাত্মক ধর্মঘট সফল করতে হবে। বাড়িতে বসে নয়, আমরা দপ্তরের বাইরে অবস্থান করব ধর্মঘটে সফল করার লক্ষ্যে। রাজ্যের কর্মচারীদের প্রতি বঞ্চনার প্রতিকার সর্বোপরি সাধারণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সফল ধর্মঘটের মাধ্যমে নতুন ইতিহাস তৈরি করতে হবে। সমস্ত আলোচনাকে উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যরা গ্রহণ করার পরবর্তীতে রাজ্য কাউন্সিল সভার সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে মানস দাস বলেন, আমাদের মতাদর্শই আমাদের বন্দুক (অস্ত্র)। লড়াই সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে দিশা তৈরি হয়েছে, মতাদর্শের সঠিক প্রয়োগের মধ্য দিয়েই তাকে শাণিত করে আমরা ১০ মার্চ ২০২৩-এর ধর্মঘটকে ঐতিহাসিক রূপ দিতে পারব।

সভাপতিমণ্ডলী

গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ

- ১০ মার্চ, ২০২৩, ৩ দফা দাবিতে রাজ্য প্রশাসনে আমাদের ধর্মঘট সর্বোচ্চ সাফল্যের জায়গায় পৌঁছেছে। রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীদের সাথে নিবড়ি যোগাযোগ তৈরি করেই ধর্মঘটের সাফল্যকে কর্মচারী সমাজের কাছে নিয়ে যেতে হবে।
- গোটা রাজ্য জুড়ে সমস্ত দপ্তরে কর্মরত কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে স্ব স্ব সমিতির সদস্য সংগ্রহের কর্মসূচী, ২০২৩ অভিযান আকারে গ্রহণ করতে হবে। সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্য দপ্তর সহ বেশ কিছু দপ্তরে নতুন কর্মচারী কলকাতা এবং জেলাগুলিতে চাকরিতে যোগদান করেছেন এবং যোগদানের অপেক্ষাতেও আছেন। নেতৃবৃন্দকে নব নিযুক্ত কর্মচারী সহ সমস্ত সহকর্মীর কাছে পৌঁছাতেই হবে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হাসপাতাল, কালেক্টরেট ইত্যাদি দপ্তরে যৌথভাবে এই কর্মসূচীতে নামতে পারলে সাফল্য আমাদের আসবেই। চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আগামী মে, ২০২৩-এর মধ্যে সমিতির সদস্যপদ নবীকরণের কাজ সমাপ্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এপ্রিল, ২০২৩ এবং জুন, ২০২৩-এর ত্রৈমাসিক সাংগঠনিক রিপোর্টে তার প্রতিফলন সহ সামগ্রিক বিবরণ কেন্দ্রীয়ভাবে জমা দিতে হবে।
- এমপ্লয়িজ ফোরাম এবং সংগ্রামী হাতিয়ার-এর গ্রাহক সংগ্রহের কাজ যথাক্রমে মার্চ, ২০২৩ এবং মে, ২০২৩-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। সংগৃহীত অর্থ অবিলম্বে কেন্দ্রে জমা দিতে হবে। এমপ্লয়িজ ফোরাম জেলা / অঞ্চল ভিত্তিক পৌঁছানোর জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা সহ নামের তালিকা কেন্দ্রে জমা দিতে হবে। সমিতি, জেলা ও অঞ্চলে মুখপত্রগুলি নিয়ে নিয়মিত পঠন-পাঠন সভা চালু করতে হবে।
- ২০তম রাজ্য সম্মেলনের তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ মার্চ, ২০২৩-এর মধ্যে সম্পন্ন করে তাঁর চূড়ান্ত হিসাব কেন্দ্রে দ্রুত জমা দিতে হবে। সাথে সাথে রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজও শেষ করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও অর্থ কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।
- রাজ্যের সর্বত্র ব্লক কমিটিগুলিকে সক্রিয় রাখার জন্য জেলাগতভাবে ধারাবাহিক কর্মসূচী নিতে হবে। পারস্পরিক যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করতে হবে।
- সংগঠনের সর্বস্তরেই কমিটি ফাংশনিংকে জোরদার করতে হবে। নিয়মিত পর্যালোচনা করে যৌথ ফাংশনিংকে আরও উন্নত করতে হবে।
- মার্চ মাসের মধ্যে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'-র কর্মসূচী সম্পন্ন করতে হবে। বিষয় ঃ সমানাধিকারের সংগ্রাম ও বর্তমান প্রেক্ষিত।
- ৫ এপ্রিল, ২০২৩ ঐতিহাসিক শ্রমিক-কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের ডাকে 'দিল্লী চলো' জমায়েতে সংগঠনের গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপস্থিত থাকতে হবে।
- আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস ১ মে, ২০২৩ যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে হবে। আলোচনার বিষয় ঃ অর্জিত অধিকার রক্ষায় ঐক্য ও সংগ্রাম।
- আগামী দিনে মতাদর্শগত সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর মে, ২০২৩-এর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবির জেলা ও কেন্দ্রে সংগঠিত করতে হবে। বিষয় ঃ কর্পোরেট হিন্দুত্ববাদী গেম প্ল্যান বনাম ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র।
- অভিজ্ঞতার নিরিখে গ্রামীণ মানুষ অবাধ-সুষ্ঠ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সে বিষয়ে সচেতন ভূমিকা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। প্রচারমূলক কর্মসূচী হিসাবে ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্বে বহুবিধ কর্মসূচীর পাশাপাশি নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচী প্রতিপালনের যথাযথ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক টিম গঠন করে প্রচারে নামতে হবে।
- সর্বভারতীয় সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭ দফা দাবিতে আগামী ১৪ মার্চ '২৩ টিফিনের সময় ধর্ণা কর্মসূচী সংগঠিত করতে হবে। আগামী ৩০ এপ্রিল '২৩-এর মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৭ দফা দাবিতে রাজ্য কনভেনশনের ভিত্তিতে প্রতিটি জেলাস্তরে কনভেনশন করতে হবে।
- আসন্ন সংগ্রামকে সামনে রেখে আগামী ১৭ মার্চ, ২০২৩ ছুটির পর সমিতির সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও মুখপত্রের সম্পাদকদের নিয়ে 'মুখপত্র গাইডলাইন' সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- সর্বভারতীয় সংগঠনের আহ্বানে এপ্রিল-মে, ২০২৩-এর মধ্যে ব্লকস্তর পর্যন্ত দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদে ''ভেহিকেল জাঠা'' সহ মিছিল ও সমাবেশ করতে হবে।
- আগামী ১৭-২০ এপ্রিল, ২০২৩ ব্লক স্তর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সফর সূচী হবে। প্রতিটি ব্লকে জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ব্লক কমিটিগুলিকে সক্রিয় করা এবং কর্মচারীর কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যেই ব্লক সফর সূচী অনুষ্ঠিত করতে হবে। সবস্ত জেলাকে পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাখতে হবে।
- সংগঠনের সার্বিক কর্মকাণ্ড, কর্মসূচী রূপায়ণে ও দৈনন্দিন কাজ সুষ্ঠভাবে করার লক্ষ্যে ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সংগঠনের সর্বস্তরের উপযুক্ত ভূমিকা পালনে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সহ সমিতিগুলির নেতৃত্ব ও নবীন প্রজন্মের কর্মী-সংগঠকদের যুক্ত করে ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ উপ-সমিতি গঠন করা হয়েছে। □

রাজ্য কাউন্সিল সভায় উপস্থিতির একাংশ

দেবাশীষ রায়

ভ্রম সংশোধন

ডিসেম্বর ২০২২ সংখ্যা সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিশংতিতম রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্টিং-এ মাইন্যুটস কমিটির সদস্যদের নামের তালিকায় কনিকা টুডুর নামটি ভুলবশত বাদ পড়ে গেছে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।—**সম্পাদকমণ্ডলী**

বন্ধুত্ব দিয়ে গৌতম আদানিকে আড়াল করা চলবে না

উৎসর্গ মিত্র

আদানি গ্রুপকে নিয়ে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এ বছরের জানুয়ারি মাসে আর সে রিপোর্ট প্রকাশ পাবার সাথে সাথেই হইচই পড়ে গিয়েছে চারপাশে। সে হইচইয়ের এমনই দাপট যে এতোদিন ধরে জেনে আসা পৃথিবীর তিন নম্বর ধনী শ্রী গৌতম আদানি হুড়মুড়িয়ে হড়কে নেমে একেবারে ছাব্বিশ নম্বরে পৌঁছে গেছেন। শেয়ার মার্কেটে তাঁর সব কোম্পানীর দর তলানিতে। একের পর এক কোম্পানী তাদের গাঁটছড়া খুলে ফেলে ত্যাগ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ভবিষ্যত কি হবে জানা নেই, তবে শ্রী আদানির বর্তমান যে একেবারে ঝরঝরে হয়ে পড়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শ্রী গৌতম আদানি এক সময়ে ছিলেন গুজরাটের মাঝারি মানের এক হীরে ব্যবসায়ী। গুজরাটে এমন ব্যবসায়ীর সংখ্যা নেহাৎ কম না, কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে শ্রী আদানির যেমন বন্ধুত্ব, তেমন আবার খুব কম ব্যবসায়ীর আছে। সুতরাং....

সুতরাং দুয়ে দুয়ে চার হতে খুব বেশি সময় লাগেনি এবং অচিরেই শ্রী আদানি দেশের এক নম্বর অর্থবান পুরুষে পরিণত হয়েছেন। সেদিনের হীরে ব্যবসায়ী আদানি এখন 'আদানি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর কর্ণধার। বন্দর, খনি, সমর বিদ্যা, চায়ের জিনিস, ইলেক্ট্রিসিটি, জমি-বাড়ি কেনা বেচা মায় প্রতিরক্ষা— মেলা ব্যবসা তাঁর। 'ভিকাশ পুরুষ'-এর বাম হস্ত তাঁর কাঁধে, সুতরাং তাঁর সম্পত্তির বিকাশও হয়েছে দ্রুত গতিতে। মোদি সরকারের সূচনায় অর্থাৎ ২০১৪ সালে যে আদানির সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৭.১ বিলিয়ন ডলার, ২০২২ সালে সে আদানির সম্পত্তির পরিমাণ রকেটের গতিতে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০ বিলিয়ন ডলারের উপর। কিন্তু কোথা থেকে এসে গোল সাধলো হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট— 'গেল গেল' রব ফেলে দিল চার পাশে।

'হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ' আসলে একটি বিনিয়োগ গবেষণা সংস্থা, যার প্রতিষ্ঠাতা নাথান অ্যান্ডারসন এবং সদর দপ্তর নিউ ইয়র্কে। ১৯৩৭ সালে মার্কিন বাজারে অন্যতম আর্থিক কেলেঙ্কারি ছিল 'হিন্ডেনবার্গ কাণ্ড'। সেই ঘটনার সূত্রেই নিজের সংস্থার নাম দিয়েছেন অ্যান্ডারসন। এদের লক্ষ্য এমন সব আর্থিক ফাঁক খুঁজে বের করা, যা ধরতে পারলে আগে থেকেই বিপর্যয়ের সম্ভাবনা চিহ্নিত করা যায়।

এক কথায় কর্পোরেট জালিয়াতি এবং চোখে ধুলো দেওয়ার ঘটনাগুলি ফাঁস করাই হচ্ছে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের মূল লক্ষ্য। এর আগে নিকোলা, ক্লোভার হেলথ, কাণ্ডি, লর্ডসটাউন মোটরস এবং টেকনোগ্লাসের মতো সংস্থার শেয়ার জালিয়াতির রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল তারা। নিকোলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড়ো শেয়ার জালিয়াতির ঘটনা। ২০২০ সালে নিকোলার রিপোর্ট প্রকাশের পরপরই সংস্থার আসল ছবি ফুটে বেরোয়। কার্যত বিনা ব্যবসাতেই হাজার হাজার কোটি টাকার শেয়ার দর দাঁড় করিয়েছিল নিকোলা। হিন্ডেনবার্গের রপোর্টে তা জানাজানি হতেই বিপুল পতন হয় নিকোলার শেয়ারে। ফাঁস হয় নিকোলা নামের ই ভি সংস্থার মিথ্যা ব্যবসা। বর্তমানে কার্যত কোনও পাত্তাই নেই নিকোলার।

কোনও 'সন্দেহজনক' বড়ো সংস্থার প্রকাশিত তথ্য এবং অভ্যন্তরীণ কর্পোরেট নথির মাধ্যমেই রিপোর্টগুলি তৈরি করে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ। এর পাশাপাশি সংস্থার কর্মীদের থেকেও তারা তথ্য সংগ্রহ করে এবং সে কাজে প্রয়োজনে উপহারের নামে ঘুষ দিতেও পিছ পা হয় না তারা। এভাবে দেখা হয় সংস্থার কোনও আর্থিক ফাঁক আছে কিনা এবং সে 'ফাঁক' খুঁজে পেলেই তা কাজে লাগিয়ে সে সংস্থার ভিত নাড়িয়ে তারা দেয়; যেমনটা করেছে তারা শ্রী আদানির ক্ষেত্রে।

রিপোর্ট অনুযায়ী আদানি তাঁর প্রায় ৮৫ শতাংশ ব্যবসাকেই ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল হিসাব দেখিয়ে (unethical accounting practice) ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দৈত্যাকৃতি করে হাজির করেছেন। যে বিপুল পরিমাণে ঋণ আদানি গ্রুপের রয়েছে, চূড়ান্ত হিসেব (final account) দাখিলের সময়ে তার প্রায় কিছুই দেখানো হয়নি। ফলে তাদের দেখানো লাভের পরিমাণ (শুধু ২০২১ সালেই ১১ বিলিয়ন ডলার) হয়ে দাঁড়িয়েছে আসল লাভের বহু গুণ। ঠিকঠাক হিসেব দেখালে চেহারাটা হতো এর উল্টো। কোম্পানীগুলোর যতটা হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারা এতো দিন মানুষের সামনে দেখানো হচ্ছিল, হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট বলছে সেটা একেবারেই মিথ্যে চেহারা— আসলে তারা বেশ রুগ্নই। শ্রী আদানি এটা করিয়েছিলেন যাতে তাঁর লাভের এই বিপুল পরিমাণ দেখে শেয়ার বাজারে তাঁর কোম্পানিগুলির দর চড়চড় করে বাড়তে পারে এবং শেয়ার বাজারের এই দর দেখিয়ে ব্যাংকগুলির কাছ থেকে তিনি আরও বেশি করে এবং আরও নির্বিঘ্নে ঋণ নিতে পারেন। একে নিখাদ জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, কারণ এই কারবারের ফলে জনগণের টাকা বিনা বাধায় ঢুকে যায় শ্রী আদানির পকেটে এবং তিনি লাভের উপর লাভ করতেই থাকেন।

হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট আরও বলছে যে এক দিকে যেমন ঋণের পরিমাণ চেপে যাওয়া হয়েছে হিসেব দেখানোর সময়ে, অন্যদিকে আদানির যে ৫০০-র উপর সহায়ক শিল্প (subsidiary) এবং যৌথ ব্যবসাগুলি (joint venture) রয়েছে, সেগুলির লাভের হিসেব গ্রুপের আর্থিক ইস্তাহারে (financial statement) দেখানো হয়নি। ফলে ওই ইউনিটগুলির মোট লাভও পরিস্কার থাকতে পারেনি আয়কর বিভাগের কাছে, ফলে যে পরিমাণ কর আদায় করা যেত শ্রী আদানির কাছ থেকে, সেটি কিছুতেই সম্ভব হয়নি। একে আর্থিক ইস্তাহারে বেশির ভাগ ঋণের কথা গোপন থাকা এবং অন্য দিকে হিসেবের ফাঁক রেখে আয়কর কম দেওয়া— দুয়ে মিলে শ্রী আদানিকে এক সর্বগ্রাসী দৈত্যের চেহারা দিয়েছিল। ভারত সরকার এবং তার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার থেকে সংগৃহীত নানা নথি দেখিয়ে হিন্ডেনবার্গ এগুলো প্রমাণ করে ছেড়েছে।

শুধু আর্থিক কেলেঙ্কারিই নয়, কারখানা তৈরি করতে গিয়ে পরিবেশগত যে যে বিষয়ের ওপর নজর রাখা জরুরী, রিপোর্ট দেখিয়ে দিয়েছে শ্রী আদানি সেগুলিকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন। ব্যাপক হারে অরণ্য নিধন, বাস্তুতন্ত্রের দফা রফা করা, মাটির নীচের জল আর ওপরের বাতাসকে বিষিয়ে দেওয়া— কোনও কিছুই তিনি বাদ রাখেননি শুধু মাত্র মুনাফার লোভে। স্থানীয় মানুষের আপত্তিকে পাত্তা দেওয়া তো দূরস্থান, এমনকি পরিবেশগত যে সমস্ত বিধি-নিষেধ আছে ভারত সরকারের, সেগুলিকে পর্যন্ত পাত্তা দেওয়া হয়নি। আদানি গ্রুপ অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই এইসব অভিযোগকে অস্বীকার করেছে, কিন্তু তাতে বাজারে তাদের শেয়ারের দাম পড়ে যাওয়াটাকে আটকানো যায়নি।

সুনির্দিষ্ট ভাবে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে শ্রী আদানির বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে, সেগুলি এরকম—

১) ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আদানির ইতিহাস বেশ গড়বড়ে। শুধুমাত্র পরিবেশগত ব্যাপারেই কিংবা হিসেবগত জালিয়াতিতেই তিনি অভ্যস্থ এমনটা নয়, এর পরেও রাজনৈতিক যোগসাজস ঘটিয়ে ভারত সরকারের ওপর চাপ তৈরি করে নানারকম সুবিধা আদায়েও দেখা গেছে তিনি বেশ সিদ্ধহস্ত।

২) আদানির কোম্পানিগুলিতে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস অথবা শেয়ার হোল্ডারদের, বিশেষতঃ দুর্বল শেয়ার হোল্ডারদের মতামতকে কোনও গুরুত্ব না দিয়েই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেন আদানি নিজে। কোনওরকম কর্পোরেট প্রোটোকল সেখানে মানা হয় না। শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ কখনোই বিচার করা হয় না।

৩) আদানির কোম্পানিগুলির আর্থিক সক্ষমতাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়। আদতে 'দেওয়া কথা' রাখার ব্যাপারে এই সব কোম্পানিগুলির ধারাবাহিকতা একেবারে তলানিতে। নিজের আয়কে অনেক বড়ো করে দেখানো এবং যখন তখন উচ্চ পরিমাণে ঋণ নেওয়া আদানির স্বভাব।

৪) বন্দর ব্যবসা (port business) আদানির অন্যতম প্রধান ব্যবসা এবং এই ব্যাবসা চালাতে গিয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক সংস্রব ব্যবহার করে নানা রকম অন্যায় সুযোগ-সুবিধা আদায় করে থাকেন।

৫) পরিবেশগত বিধি-নিষেধ বা বাস্তুতন্ত্রের ভাঙচুর করা আদানির বরাবরের অভ্যাস। শুধুমাত্র এ দেশেই নয়, সুদূর অস্ট্রেলিয়াতেও যে কয়লাখনির মালিক তিনি, সেটিরও পরিবেশগত ঝুঁকি সাঙ্ঘাতিক।

আদতে শ্রী আদানির কোম্পানিগুলির বেশির ভাগই হয় লোকসানে চলছে, অথবা সেগুলির আর্থিক পরিস্থিতি ভয়াবহ। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট ধরে ধরে এইসব কোম্পানির চেহারা লোক সমুখে এনে দিয়েছে। ক্ষেত্র অনুযায়ী যদি দেখা যায়, তাহলে ব্যাপারটা এরকম—

১) বন্দর— আদানির বন্দর ব্যবসা এখন এক তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন এবং সেই কারণে এখানে তাঁর লাভের হার বেশ কম। এখানে তাঁর আধিপত্য একচেটিয়া তো নয়ই, বরং বেশ জোরদার লড়াই অন্য কোম্পানিগুলোর সাথে চালাতে হচ্ছে তাঁকে।

২) বিদ্যুৎ— বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আদানি এখন এক তীব্র সঙ্কটের সম্মুখীন কারণ এখানে তাঁর বিপুল পরিমাণে ঋণ রয়েছে। এই ঋণের কিস্তি মিটিয়ে লাভের মুখ দেখা এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে অসম্ভব প্রায়। এমনিতেই ইউনিট পিছু আদানি বিদ্যুতের দাম বেশ চড়া, সুতরাং তার দাম আর বাড়ানোর পরিস্থিতি তাঁর এখন নেই।

৩) গৃহ ব্যবসা— রিপোর্ট অনুযায়ী গৃহ ব্যবসায়ে যে কোনও প্রজেক্ট শুরু করার ক্ষেত্রে আদানীর গতি বেশ শ্লথ। এই কারণে এই ক্ষেত্রে যে পরিমাণে লাভ তাঁর হওয়ার কথা, আসল লাভ তার থেকে অনেক কম।

৪) কৃষি ব্যবসা— এই ব্যবসাতেও আদানির লাভের পরিমাণ কম মূলতঃ ম্যানেজমেন্টের অব্যবস্থা এবং অদক্ষতার জন্য। এর পরিবর্তন সাধন অন্ততঃ রিপোর্ট বেরোনর সময় পর্যন্ত হয়নি।

৫) খুচরো ব্যবসা— এই ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকলে এক জন ব্যবসায়ী সঠিক অর্থে লাভ করতে পারেন, আদানির সেই মনোভাব একেবারেই নেই। সস্তায় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বাজার দখল করতে গিয়ে এই ক্ষেত্রে আদানির লাভ তলানিতে।

অবধারিত ভাবেই আদানি গ্রুপ হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের প্রতিটা অভিযোগকে অস্বীকার করেছে শুধু নয়, এর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে। একাধিক বিবৃতি জারি করে আদানি গ্রুপ ব্যবসা, পরিবেশ এবং আইনের প্রতি তার দায়বদ্ধতা জানিয়েছে, কিন্তু যে প্রশ্নগুলো হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট তুলে দিয়েছে মানুষের সামনে, সেগুলোর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার দরকার যে কোনও উপায়ে। অভিযুক্ত অভিযোগ অস্বীকার করবে— এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু অভিযোগের অসারত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব তারই— এটাও দস্তুর। বিশেষ করে পরিবেশগত দিক দিয়ে এবং দেশের রাজস্ব ফাঁকির বিষয়ে আদানির প্রতি করা অভিযোগের কিয়দাংশও যদি সত্যি হয়, তাহলে তার ফল অবশ্যই মারাত্মক। সুতরাং সত্য-মিথ্যে জানার অধিকার মানুষের আছে। আদানি গ্রুপে যাঁরা বিনিয়োগ করেছেন, এই রিপোর্ট পড়ার পর তাঁরা কি করবেন, তাঁদের ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু অভিযোগের সারবত্তার সাথে মানব সভ্যতার এবং এই দেশের আর্থিক ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে, দেশের সরকারের উচিত তাই এ প্রসঙ্গে সার্বিক ভাবে স্বচ্ছ থাকা

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, 'স্বচ্ছতা' আর মোদি সরকার এখন পরস্পর বিপরিতার্থক শব্দ। বহু ক্ষেত্রেই এটা প্রমাণিত এবং সেটা আবারও প্রমাণের অপেক্ষায় এই আদানি কাণ্ডে। এ ব্যাপারে আলোচনার করার আগে শ্রী আদানির সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন—

১) গৌতম আদানির ছোটো ভাই রাজেশ আদানিকে ২০০৪-০৫ আর্থিক বর্ষে বিভিন্ন রকম কর ফাঁকি, জাল নথি সরবরাহ, বে-আইনী পথে কয়লা আমদানী সহ একাধিক অভিযোগে প্রথমে ১৯৯৯ এবং ফের ২০১০ দিল্লীর 'ডাইরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স' (DRI)-এর হাতে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল। আদানির হীরে ব্যবসার নানা কেলেঙ্কারিতে মুখ্য ভূমিকা ছিল এই রাজেশ আদানির। এতদ্ সত্ত্বেও আদানি গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করে রয়েছে এই কীর্তিমান।

২) সমীর ভোরা শ্রী আদানির শ্যালক। হীরে কেলেঙ্কারির 'রিং লিডার' বা সঞ্চালক হিসাবে এনাকেই ধরা হয়। তদন্তকারীদের বারংবার মিথ্যা কথা বলার জন্য এবং গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াকে ভুল দিকে চালনা করার বারংবার চেষ্টার জন্য ডি আর ডি ও এনাকেও গ্রেপ্তার করেছিল। এহেন ভোরাকে শ্রী আদানি তাঁর অস্ট্রেলিয়া ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বানিয়ে রেখেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় আদানির কীর্তি আগেই আলোচিত। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে গিয়েও ভোরা তাঁর স্বভাব পরিত্যাগ করেননি।

৩) বিনোদ আদানি শ্রী আদানির দাদা এবং আদানি গোষ্ঠীর একটি 'ভুয়ো' কোম্পানীর দায়িত্বপ্রাপ্ত। ২০১৬ সালে পানামা দুর্নীতি এবং ২০২১ সালে প্যান্ডোরা পেপার দুর্নীতিতে জড়িয়ে আছে বিনোদের নাম। আপাদমস্তক কালিমা লিপ্ত এই পুরুষ দেশে থাকাটা ঝুঁকিপূর্ণ বিচার করে এখন দুবাইয়ের স্থায়ী বাসিন্দা বনে গিয়েছেন অর্থাৎ তিনি এখন 'এন আর আই' এবং তিনি নাকি এখন 'ধনীতম' এন আর আই-দের অন্যতম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আদানি গ্রুপের মোট ২২টি মুখ্য পদের ৮টিই দখল করে আছেন শ্রী আদানির আত্মীয় স্বজনেরা এবং এনাদের সবাইই কোনও না কোনও কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত। এমনকি আদানির ভাইঝির শ্বশুর যতীন মেটার নামও জড়িয়ে আছে হীরে কেলেঙ্কারিতে। এঁদের সবার ওপরে আছেন আদানি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক শ্রী গৌতম আদানি স্বয়ং, যিনি আবার আমাদের প্রধান মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন— এতটাই ঘনিষ্ঠ যে ২০১৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর মোদি কোনও সরকারি বিমানে নয়, আদানির নিজস্ব বিমানে করেই দিল্লী যাওয়া পছন্দ করেছিলেন। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে যাই-ই লেখা থাকুক না কেন, আজ পর্যন্ত মোদি-আদানি বন্ধন অটুট এবং আর্থিক ক্ষেত্রে মোদির 'ভিশন ৩০'র পোস্টার বয়ের নাম এখনও পর্যন্ত সমস্ত কেলেঙ্কারির পরেও শ্রী গৌতম আদানি।

সমস্যাটা এখানেই। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, 'A man is known by the company he keeps' অর্থাৎ একজন মানুষকে তার বন্ধুদের মাধ্যমেই চেনা যায়। সুতারাং আদানিকে দেখলেই মোদি সম্পর্কে আন্দাজ করা খুব শক্ত নয়। এহেন মোদি তাই আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে নিজে থেকে তদন্ত চালিয়ে 'স্বচ্ছ ভাবে' সমস্তটা মানুষের সামনে নিয়ে আসবেন এবং সদর্থক ব্যবস্থা নেবেন— এমন চিন্তা 'আকাশ কুসুম' ছাড়া আর কিছু নয়। দেখাও যাচ্ছে তেমনই। দেখা যাচ্ছে লোকসভা অধিবেশনে সরকার কিছুতেই আদানি শুধু না, গোটা হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট নিয়েই আলোচনা করতে দিতে নারাজ— ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরস্ত। এমনকি গোটা ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি বা সংসদীয় যৌথ কমিটি গঠনেও আপত্তি তাদের। এ ব্যাপারে কোনও শব্দও যাতে সংসদে শোনা না যায়, তার জন্যে নজির বিহীন ভাবে নিজেরাই হট্টগোল পাকিয়ে বারেবারে অধিবেশন ভণ্ডুল করে দিতেও পিছ পা হচ্ছে না তারা। এর একটা কারণ যেমন 'পি এম কেয়ার্স ফাণ্ড'এ হাত পেতে আদানির কাছ থেকে ১০০ কোটি টাকা নেওয়া, তেমনই আর একটা কারণ অবশ্যই মোদি-আদানি ঘনিষ্ঠতা। এ এমনই এক ঘনিষ্ঠতা, যা স্বাধীন ভারতে কোনও দিন কোনও প্রধান মন্ত্রীর সাথে কোনও ব্যবসায়ীর দেখা যায়নি। যে ভাবে একের পর এক বিমান বন্দর এবং জাহাজ বন্দরের লাইসেন্স আদানিকে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, যে ভাবে আদানির ব্যবসার স্বার্থে দেশের পরিবেশ আইনের বদল ঘটানো হয়েছে, তা ভিন্ন অর্থে 'বন্ধুত্বের সেরা নিদর্শন' বলেই গণ্য হওয়ার যোগ্য— সঠিক অর্থে 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম' বা ধান্ধার ধনতন্ত্রের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই বন্ধুত্ব।

কিন্তু এত সহজে তো ছেড়ে দেওয়া যাবে না! দেশের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সরকারি বীমা কোম্পানি এল আই সি-কে দিয়ে জোর করে আদানি গ্রুপে ৮০,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করানো হয়েছিল। সে টাকা জনগণের টাকা, সাধারণ গরীব মানুষের টাকা। আদানির যাবতীয় ঋণের ৪০ শতাংশই সরবরাহ করা হয়েছে সরকারি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে। সে টাকা জনগণের টাকা, সাধারণ গরীব মানুষের টাকা। কিছুতেই ছাড়া যাবে না। বিচার ব্যবস্থার ওপর ভরসা করে লাভ নেই কারণ দেখা গেছে ডি আর আই বা সমগোত্রীয় নানা নিয়ন্ত্রক সংস্থা যতো বারই বিভিন্ন জালিয়াতির প্রমাণ পেয়ে আদানি, তার ঘনিষ্ঠ লোকজন বা অন্য কাউকে ধরেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেছে, ততো বারই বিভিন্ন ট্রাইবুনাল এসে তাদের বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কোনও এক অদৃশ্য কারণে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোও আর আপীলে যায়নি।

মোদিকে তাই বাধ্য করতে হবে। বাধ্য করতে হবে সমস্ত সত্যি মানুষের সামনে নিয়ে আসতে। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্ব এখন সব ভুলে এক হয়ে মোদিকে বাধ্য করানো সৎ ভাবে কাজ করতে নতুবা সততার সাথে তাকে মসনদ থেকে হঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। এর বাইরে অন্য কিছু হলেই তা হবে দেশের বিশ্বাসযোগ্যতার পরিপন্থী। কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না তো তা!! □

অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের সাক্ষাৎকার

জলপাইগুড়িতে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন (২৪-২৬ ডিসেম্বর, ২০২২) চলাকালীন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক মনোজিৎ দাসের এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সংগ্রামী হাতিয়ার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুতপা হাজরা, শাশ্বতী মজুমদার, কুমকুম মিত্র এবং দেবাশীষ রায়। সাক্ষাৎকারটি পরসিরজনিত কারণে পূর্ণাঙ্গরূপে পত্রিকায় প্রকাশ করা গেল না। সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হল। ছবিটি তুলেছেন আশীষ মিত্র

প্রশ্ন ঃ রাজ্য সম্মেলন আপনাদের জেলায় অনুষ্ঠিত হবে এটা জানার পর আপনারা কবে থেকে প্রাথমিক পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমরা যখন রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জেলাগতভাবে প্রস্তাবনা দিই, তখন থেকেই মানসিক প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম। কারণ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৬ থেকে জলপাইগুড়িতে কোনোদিনও কনফারেন্স হয়নি। এবারেই প্রথম।

প্রশ্ন ঃ পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানে বিশেষ করে কোন কোন বিষয়ের উপরে গুরুত্বটা দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা অনেক কিছুই চিন্তা করেছি, কিন্তু মূল যে বিষয়টা বর্তমান সময়ে প্রয়োজন হয়, সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সহায়তা। জলপাইগুড়িতে এখনও পর্যন্ত তথাকথিত বিশ্বায়নের প্রভাব অতটা পড়েনি। এটা একটা পকেট টাউন। সবার মধ্যে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে সম্মেলনটা করবার ক্ষেত্রে বাধার মূল জায়গাটা ছিল অর্থনৈতিক। দান মেলা ও অর্থ সংগ্রহটা ভালোভাবে করার পর মনে প্রথম জাগল যে আমরা প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে কিভাবে থাকার সুবন্দোবস্ত করতে পারব। আমরা প্রস্তাবনা দেওয়ার সময়ই আমাদের পুরো ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়ে যায়, যাকে থিওরিটিক্যালি যদি বলি আমরা কতটা কী করতে পারব মনের মধ্যে ছিল, তা মানুষের দ্বারা রূপায়ণ ঘটেছে।

প্রশ্ন ঃ মে মাসে দান মেলা করার জন্য কী পরিকল্পনা করেছিলেন?

উত্তর ঃ এটা যখন আলোচনা হয় কলকাতা থেকে বিভিন্ন নেতৃত্ব এসে আমাদের বলতে শুরু করেন তখন থেকেই আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। আমাদের যারা অন্তর্ভুক্ত সমিতি, এখন ১৮টার মতো অর্গানাইজেশন আছে জলপাইগুড়িতে। অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলি এবং সহযোগী পেনশনারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা কত অর্থ ঐদিন সংগ্রহ করতে পারব তা নিশ্চিত করি। আমরা জানতাম যে শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ততা ও আবেগের উপর ভিত্তি করে সম্মেলন আমরা করতে পারব না। এর জন্য আমাদের টোটাল সাবজেক্টিভ রিয়েলিটি আরো স্ট্রং করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন ধরনের প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আপনার মতামত আমরা জানতে চাই?

উত্তর ঃ রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রচার মূলক কর্মসূচী যেটা প্রাথমিক যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে জনগণের সঙ্গে আমাদের যে দেওয়াল ভাঙার বিষয়টা সরকারী কর্মচারীদের সম্পৃক্তকরণের বিষয়টা সেটা করবার কথা। সেটা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি করতে পেরেছে। এবার এই বিষয়টা যখন আমি বা আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছি আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল এটা যে জনগণের সাথে আমাদের দেওয়ালটা ভাঙতে হবে। পুরো বিষয় ছিল একটা হচ্ছে যে কর্মচারীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও নিবীড় করা, দ্বিতীয়ত হচ্ছে জনগণের সাথে আমাদের সম্পর্কের যে রসায়ন সেই সম্পর্কের রসায়নটাকে কিভাবে মজবুত করা যায় এটা আমাদের দুটো প্রাথমিক বিষয় ছিল এবং এটার উপর দাঁড়িয়েই আমরা এই কর্মসূচীগুলি গ্রহণ করেছি। যে কর্মসূচীগুলি আমরা নিয়েছি, তা হল বিকল্প একটা চিকিৎসা মডেল তুল ধরা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির, আমরা পাঁচটা জায়গায় করেছি এবং পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় করেছি। কোথায় কোথায় করলাম আমরা—আমরা করলাম একটা তিস্তা রিভার বেড-এ। এক্ষেত্রে গণআন্দোলনের সেখানকার যারা নেতৃত্ব আছেন তারা আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছেন। আমরা আর একটা করেছি নাগরাকাটা শুলক পাড়া। চা-বাগানের ভিতরে, সেখানেও মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে খুবই দূরবস্থা। আর একটা করা হল জলপাইগুড়িতে, যেখানে তেভাগার আন্দোলনের স্মারক যেখানে রয়েছে, যেখানে তেভাগার মাটি, যেখানে বিপ্লীবদের রক্তে রক্তস্নাত হয়েছিল সেই পূর্বতন হায় হায় পাথর এখন মাথা চুলকাতো সেইখানে আমরা সেটা করেছি। আমরা আরও দুটো জায়গায় করেছি। সে দুটো জায়গা হচ্ছে খুবই দুর্গম অঞ্চল। আমরা যখন তাদের কাছে গেছি এবং এটা বলতে খুব গর্ববোধ হয় এবং হয়তো আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ব তারা হয়তো নিজেরা দুবেলা খেতে পারেন না, ঠিক ঠাক খেতে পারেন না, কিন্তু তারা আমাদের শুধুমাত্র চা-বিস্কুট খাইয়ে ছাড়েননি, তারা আমাদের দুপুরের খাবারের পর্যন্ত ব্যবস্থা করেছেন এবং এটা টোডাগাওতে করেছে, লাস্ট যেটা আমরা করলাম জলপাইগুড়িতে, জলপাইগুড়িতে ৩৪টা বনবস্তি রয়েছে। সেখানে সরস্বতী ফরেস্ট ভিলেজে করলাম। আমাদের মহিলা কমরেডরা গেলেন নার্সিং এ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন জায়গায় মানে সেখানে যেভাবে বরণ করা হয়েছে আদিবাসী তাদের যে Custom মেনে প্রথা মেনে এটা যেমন তারা করেছেন, তারাও দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। মানে এই সমস্ত জিনিসগুলি হচ্ছে আমরা পেরেছি, আমরা যে প্রাণী স্বাস্থ্যশিবির যেটা করেছি তিনটি, তিন জায়গায় আমরা করেছি। আরেকটা যে কর্মসূচী আমরা করেছি সেটা হচ্ছে এই যে সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে আমরা অঙ্কন প্রতিযোগিতা করেছি এবং এখানেও যে বিষয়বস্তু আমরা রেখেছি, সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ, তেভাগার ৭৫—এইরকম থিমের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে বা যাঁরা ছবি আকেন তাদের কাছ থেকে আমরা ভাবনার জোগান নিতে চেয়েছি। সম্মেলনের প্রাঙ্গনে যে সমস্ত ছবি রয়েছে, তার বেশ কিছু ভাবনা

তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে। আর হচ্ছে ম্যারাথন প্রতিযোগিতা এবং ম্যারাথনের পয়েন্টগুলো আমরা করলাম যে যেখানে হচ্ছে পঞ্চায়েত এলাকাগুলো আছে, আমরা এটা একদম পরিষ্কারভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে শুধুমাত্র এন জি ও ঢঙে বা অন্য কোনো ঢঙে আমরা ম্যারাথন প্রতিযোগিতা করব না। আমরা নির্দিষ্ট রুট নির্বাচন করেছি। ম্যারাথনকে কেন্দ্র করে প্রায় ২২৫-২৩০ ম্যারাথন রানার দৌড়েছেন তাদেরকে আমরা জনস্বার্থবাহী দাবি সম্বলিত গেঞ্জি দিয়েছি । যেমন সকলের জন্য কাজের অধিকার চাই, সকলের জন্য সর্বজনীন শিক্ষা, সর্বজনীন স্বাস্থ্য। এখানে আমরা সাধারণ দাবির সাথে সাথে মহিলাদের দুটো দাবি যুক্ত করেছি। মহিলাদের স্বাধিকার রক্ষা, মহিলাদের নিরাপত্তা এই দাবিগুলো আমরা যুক্ত করেছি। আমরা গর্বিত যে মহিলাদের ম্যারাথনে জলপাইগুড়ির ইতিহাসে এত জন মহিলা কোনোদিও দৌড়াননি। একসাথে ৬০-৭০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেছেন। এটা আমরা বলতে পারি যে এখন আমরা সম্মেলনের পরে একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখান থেকে আমরা সেই শক্তিটাকে নিয়ে কিছুটা এগোতে পারি। কাজ করবার মতো জমি আমরা তৈরি করেছি, মহিলা কমরেডদের আমরা পেয়েছি এবং তাদের মূলস্রোতে টেনে নিয়ে আসতে পেরেছি। দায়বদ্ধতার প্রকাশ তারা ঘটিয়েছেন। বিশেষত স্বাস্থ্য শিবিরগুলোতে প্রত্যেক সপ্তাহে কাজ করার মধ্য দিয়ে রবিবার দিন পরিবার ছেড়ে দূরবর্তী স্বাস্থ্যশিবিরগুলোতে যাওয়া মহিলা কর্মচারীদের এত সহজ নয়। বাড়িতে ছোটো বাচ্চা রেখে গেছেন, সাত-আট ঘণ্টা শিবিরগুলোতে থেকেছেন। আমাদের জাঠা কর্মসূচী হয়েছে। আমরা দুটো কর্মসূচী করেছি। ১৫ কিলোমিটার হেটেছি। বেরুবাড়ি বাংলাদেশ বর্ডার থেকে হেঁটেছি, জলপাইগুড়ি চা-বলয় থেকে ১৫ কিলোমিটার আমরা হেঁটেছি। আর বাইক র‍্যালিটা আমরা করেছি, যে সমস্ত জায়গায় চা-বাগান-এ কৃষি বলয়, যেখানে বিত ১০ বছরে লাল ঝাণ্ডা দেখা যায়নি, সে সমস্ত রুট বেধে আমরা করেছি এবং এটাও আমরা গর্বিত যে প্রত্যেকটি বাইক র‍্যালিতে ৫০-এর বেশি কমরেড বাইক চালিয়েছেন এবং রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর জায়গা দিয়ে বাইক র‍্যালি আমরা সাফল্যের সাথে করেছি। আমাদের পুলিশ প্রশাসন থেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল দুটো জায়গায় আমরা সেটাকে প্রতিরোধ করেছি। আমরা ৫টা বাইক র‍্যালি করেছি, ৪টা ম্যারাথন করেছি, ২টা জাঠা করেছি আর সাংস্কৃতিক কর্মসূচী অঙ্কন প্রতিযোগিতা, জলপাইগুড়ির লোকসঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ৬০-৭০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা ক্যুইজ কম্পিটিশনও করেছি। স্বাধীনতার ৭৫ বছরকে কেন্দ্র করে যেখানে আমরা ভারতবর্ষের সংবিধানকে বাঁচাও-কে নিয়েই আমরা প্রশ্নোত্তর পর্ব রেখেছিলাম এবং সেখানেও আমাদের অনেকে অংশগ্রহণ করেছেন। গত ছয় মাস ধরে প্রায় ৩৮টি সরকারী ছুটির দিনে আমরা প্রত্যেকদিনই কোনো না কোনো কর্মসূচী করেছি এবং এক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব এটা মনে হয় সংগঠনে কম আলোচিত হয়, সেটা হল আমাদের পরিবারগুলোর ভূমিকা। ৩৮ দিন ধরে যেভাবে সাত-আট ঘণ্টা, ১০ ঘণ্টা আমাদের বাইরে থাকতে হয়েছে এবং একটা বড় অংশের কমরেড তারা করেছেন, তারা পরিবারের জায়গটাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। পরিবারগুলো প্রভূতভাবে সহায়তা করেছে। এটা না হলে করা যেত না।

প্রশ্ন ঃ শ্রমিক ছাত্র যুব কৃষক মহিলা সংগঠন এরা কি আমাদের কর্মসূচীগুলিতে অংশগ্রহণ করেছে? করলে কিভাবে করেছে?

উত্তর ঃ আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যেখানে কর্মসূচী করব সেখানে ওদের থাকতে বলব। কিন্তু যেটা আমরা দেখলাম ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল। আমরা লালঝাণ্ডা নিয়ে বাইক র‍্যালি করেছি। দেখলাম এসএফআই / ডিওয়াইএফআই-এর পতাকা নিয়ে ওরা সামনে এসে বলল আমরাও যাব। আমরা স্বাগত জানালাম। শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে এখানে সি আই টি ইউ-র যিনি নেতৃত্বে আছেন, আমরা যখন প্রথম চা বাগানে স্বাস্থ্য শিবিরটা করতে যাই আমাদের কিছু বাধা ছিল যে ডাক্তার পাব কিনা। কিভাবে করব, ওষুধ পাব কিনা। তখন যারা বিভিন্ন সংগঠনে আছেন তারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। অংশগ্রহণ করেছেন, শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত বললে ভুল হবে সমস্ত শ্রেণী ও গণসংগঠন অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়াও অধ্যাপকদের সংগঠন ডাক্তারবাবু অর্থাৎ চিকিৎসকদের সংগঠন থেকে সবাই এমনকি বেসরকারী চিকিৎসকও যারা আছেন, তারাও বিভিন্নভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন। জলপাইগুড়িতে পি আর সি নেই। স্টুডেন্ট হেলথ হোম-এর একটা বড় ভূমিকা আছে বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে। এর একটা ইতিহাস আছে। স্টুডেন্ট হেলথ হোমের এখন যিনি সম্পাদক তিনি থেকে শুরু করে, ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে সবাই সহযোগিতা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ যে লক্ষ্য নিয়ে আপনারা এই কর্মসূচীগুলি নিয়েছিলেন, বলা যায় যে যে সফলতার লক্ষ্যে আপনারা এগিয়ে ছিলেন, বলা যায় যে সেই লক্ষ্যকে আপনারা বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন।

উত্তর ঃ তার চেয়ে অনেক বেশি সফলতা পেয়েছি এবং এই সফলতাটাই এখন শুধু শেষ কথা নয়, এটা আমাদের চেষ্টা হবে এই ধারাবাহিকতা আমাদের রক্ষা করতে হবে। এটা শুধুমাত্র সফলতা বললে হবে না, এমন সম্পর্ক যা একটা নিবিড় বন্ধনে যুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ রাজ্য সম্মেলনে কেন্দ্র করে অভ্যর্থনা কমিটিতে ক'টি উপসমিতি গঠিত হয়েছিল? মোট কতজনকে এই উপসমিতিতে যুক্ত করা গেছিল।

উত্তর ঃ আমরা দশটি উপসমিতি গঠন করেছিলাম এবং আমাদের অভ্যর্থনা কমিটির অবয়ব অনেক বড় ছিল। সংগঠনের কেন্দ্রীয় স্তর থেকে আমাদের প্রশ্নও করা হয়েছিল এ বিষয়টি নিয়ে। কিন্তু অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করতে গিয়ে আমাদের লক্ষ্য ছিল সম্মেলনের যে পরিধি আছে সেই পরিধিকে আমাদের আরও বাড়াতে হবে। আমাদের বাড়ানো দরকার, সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা করেছি এবং আমাদের উপসমিতিতে আমরা যাদের যুক্ত করেছি, তারা সকলেই আমাদের সংগঠন ও কর্মী কোনো না কোনো স্তরে যুক্ত। স্বভাবতই উপসমিতির কাজ সবাই করেছে এবং উপসমিতির গঠন যে লক্ষ্য নিয়ে করা হয়েছে সেটা ভালোই হয়েছে। উপসমিতির পরও আমাদের স্বেচ্ছাসেবক নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ উপসমিতির বাইরে কত জন স্বেচ্ছাসেবককে যুক্ত করা হয়েছিল এবং এর মধ্য মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা কত জন?

উত্তর ঃ স্বেচ্ছাসেবকের ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত অন্তর্ভুক্ত সমিতি থেকে নিয়ে সর্বপ্রথমে ৬৮ জন পরবর্তীতে আরও তিনটি সমিতিতে ১৫ জন করে ৪৫ জন এভাবে সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছিল ১২৫ জন।

প্রশ্ন ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্মেলন যে জেলায় হয়, পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি সেই জেলাকে সাহায্য সহযোগিতা করে, এক্ষেত্রে তার কিভাবে সাহায্য করেছেন?

উত্তর ঃ সংগঠনগতভাবে একমাত্র কোচবিহার জেলা দশ হাজার টাকা দিয়েছে। এছাড়া অভ্যর্থনা কমিটি গঠন থেকে এ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী জেলা সহ সুদূর কলকাতা থেকেও বহু মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অর্থ সাহায্য করেছেন কিন্তু মার্জনা করবেন সেটার পরিমান আমি বলতে পারব না। আমরা বলেছিলাম সাহায্য করতে চাইলে অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাহায্য বাদে সংগঠনগতভাবে কোচবিহার জেলা এবং ভেটেরেনারী ফার্মাসিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এ পর্যন্ত তিন হাজার ডাকা দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রচারের জন্য কতগুলি তোরণ বা ফ্লেক্স বা দেওয়াল লিখন করা হয়েছে?

উত্তর ঃ সারা জলপাইগুড়ি জুড়ে দেওয়াল লিখন প্রায় ৪০-এর কাছাকাছি হয়েছে, তোরণ আছে ৫০-এর বেশি। গেট আছে ৫টা, এলগেট আরও ১০-১২টি, আমরা যা ভেবেছিলাম সেখানে যেভাবে আবেগের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে, সারা জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে যেভাবে ফ্ল্যাগ লাগানো হয়েছে, প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি

● দশম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উত্থান ও পতন

সুমিত ভট্টাচার্য

এক দশকের কিছু সময় আগেও, পশ্চিমবাংলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শুধুমাত্র তার গঠন কাঠামোর জন্যই নয়, কার্যকারিতার জন্যও 'গ্রামের সরকার' হিসেবে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ সংবিধান স্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে দ্বি-স্তরীয় প্রশাসন (কেন্দ্র ও রাজ্য) তার সাথে আরও একটা স্তর গড়ে উঠেছিল। তবে সংবিধানের নির্দেশকে মান্যতা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে এই তৃতীয় স্তর গড়ে উঠেছিল তা কিন্তু নয়। কারণ সংবিধানে 'পঞ্চায়েত' প্রসঙ্গটি নির্দেশাত্মক নীতি বা ডাইরেকটিভ-র প্রিন্সিপল্স্ মধ্যেই রয়ে গেছে। নির্দেশাত্মক নীতি যেহেতু আইনত বলবৎযোগ্য নয়, শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল, তাই প্রকৃত কার্যকরী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য স্বাধীনতার পরেও অপেক্ষা করতে হয়েছে তিন দশক। এবং এক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার।

অবশ্য এর মানে এটা নয় যে, বামফ্রন্টই প্রথম স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েত গঠন করল। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বলে গ্রামকেন্দ্রীক এক ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তার আগেও ছিল, এমনকি ব্রিটিশ শাসিত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষেও ছিল এবং তা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই। স্বাধীন ভারতের শাসকেরাও যে পঞ্চায়েতকে শাসন ব্যবস্থার একটা অঙ্গ হিসেবে একেবারেই বিবেচনা করেনি তা নয়। একেবারে বিবেচনার বাইরে রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথের পল্লী সমাজ এবং বিশেষ করে গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজের ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ না করলেও (কারণ পণ্ডিত নেহরুর এই বিষয়ে ভিন্নমত ছিল), একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল না।

এই প্রসঙ্গে যা উল্লেখযোগ্য তা হল, গান্ধীজীর গ্রাম-স্বরাজের ভাবনা নিয়ে যতটা আলোচনা বা চর্চা হয়, ঠিক ততটা আলোচনা বা চর্চা রবীন্দ্রনাথের 'পল্লী সমাজ' ভাবনাকে নিয়ে হয় না। অথচ এই সমস্ত বিষয়কে নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের অনেকেরই অভিমত হল আধুনিক ভারতে পঞ্চায়েত সম্পর্কিত ভাবনার পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথই। তিনি তাঁর স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে পল্লী সমাজ পরিচালনায় ১৫ দফা কর্মসূচী নির্দিষ্ট করেছিলেন। যাঁর মধ্যে রয়েছে কৃষি, গ্রামীণ শিল্প, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পানীয় জল, নারী শিক্ষা, লোক-সংস্কৃতি, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা প্রভৃতি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই ১৫ দফা কর্মসূচীর প্রতিটিই বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রাম উন্নয়ন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতোই গান্ধীজীরও সুনির্দিষ্ট ভাবনা ছিল। তবে তা কিছুটা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথ বহির্বিশ্ব থেকে গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে উন্নয়নের কথা বলেননি। কিন্তু গান্ধীজীর স্বপ্ন ছিল স্বাধীন স্বয়ংশাসিত গ্রাম সমাজ ব্যবস্থা। স্বয়ং-সম্পূর্ণ, আত্মনির্ভর গ্রামগুলির সমষ্টিতে গড়ে ওঠা গ্রাম স্বরাজ। এক কথায় বলা যায় রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন গ্রাম জীবনের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে। আর গান্ধীজী চেয়েছিলেন গ্রাম জীবনের সংস্কার সাধন করতে।

গ্রাম উন্নয়ন সম্পর্কে নেহরুর ভাবনাই ছিল ভিন্ন। তিনি মার্কিন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ১৯৫২ সালে ২ অক্টোবর, অর্থাৎ গান্ধীজীর জন্মদিবসে ব্লক স্তরে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী চালু করেন। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক এই পরিকল্পনা কার্যত গ্রামের ধনী সম্প্রদায় অর্থাৎ জমিদার-জোতদারদের হাতকেই শক্ত করে। এই সমস্ত উন্নয়নের ভাবনা মুখ থুবড়ে পড়ছে দেখে, বিকল্প পরিকল্পনার খোঁজে কেন্দ্রীয় সরকার বলবন্ত রাও মেহেতা কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিল। এই সুপারিশগুলি নিয়ে বিস্তর আলোচনা-চর্চা সরকারী স্তরে চললেও, রূপায়ণের প্রশ্নে কার্যত কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। বলবন্ত রাও মেহেতা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রণীত পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী ১৯৬১ সালে বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচন হয়। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে গ্রাম উন্নয়নের বিষয়টির কোনো অগ্রগতিই ঘটেনি। কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিরা পঞ্চায়েতগুলিকে দখল করে মৌরসী পাট্টা তৈরি করল।

পরাধীন ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মতো দুজন ব্যক্তিত্ব পঞ্চায়েত সম্পর্কিত রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে পণ্ডিত নেহরু কিছু উদ্যোগ নিলেন, আইনও তৈরি করা হল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। কেন? এই কেনর উত্তর খুঁজতে হলে, আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতা কোন্ কোন্ শ্রেণীর কুক্ষিগত হল, সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট বোঝাপড়া দরকার। কিন্তু সেই বিষয় যাওয়ার আগে আমরা আরও একটু অতীতের দিকে ফিরে তাকাবো। অতীতের দিকে ফিরে তাকালেই বোঝা যাবে, দেশ স্বাধীন হলেও, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক লিগ্যাসি বহন করছিল। কারণ সরকারীভাবে ব্রিটিশরাই প্রথম এদেশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করে। তবে ব্রিটিশ শাসনের আগেও এদেশে কোনো না কোনো ভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিল। প্রাক্ ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রভিশনাল গভর্নর জেনারেল স্যার চার্লস্ মেটকাফে গ্রামীণ ভারতে 'ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র' বা 'Little Republic'-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

ইংরেজ শাসনে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন চালু করার জন্য একের পর এক আইন প্রণীত হয়। যেমন ১৮৭০ সালে চালু করা হয় 'বেঙ্গল চৌকিদারি আইন', ১৮৭৪ সালে চালু হয় 'স্থানীয় স্বশাসন' ব্যবস্থা, ১৮৮২-তে লর্ড রিপনের প্রস্তাব অনুযায়ী গঠিত হয় 'জেলা ও লোকাল বোর্ড'। ১৮৮৫ সালে আসে 'বেঙ্গল লোক্যাল সেলফ্ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট'। আরও পরে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯১৯ সালে চালু হয় দ্বৈত শাসন সংক্রান্ত সরকারী আইন। এইভাবে ব্রিটিশ শাসনে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে একাধিক আইন চালু হলেও, এর সুফল গ্রামের জমিদার ও তাদের সেরেস্তার লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮ ঃ গণতন্ত্রের হত্যা

একাধিক আইন প্রণয়ন দেখে প্রশ্ন উঠতে পারে ব্রিটিশ সরকার কি সত্যিই শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন চেয়েছিল? যারা ভারতবর্ষকে শোষণ ও লুণ্ঠন করার জন্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে, তারা স্থানীয় স্বশাসন সম্পর্কে এতটা আগ্রহী, এটা কি স্ব-বিরোধিতা নয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রাম ভারতের কৃষিজীবী মানুষের একের পর এক গণ অভ্যুত্থানের দিকে নজর দিতে হবে। সন্ন্যাসী বা ফকির বিদ্রোহ (১৭৬০), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৭৮৪), চোঁয়ার বিদ্রোহ (১৭৯৮), কোল বিদ্রোহ ও তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার লড়াই (১৮৩১), সিপাহী বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ (১৮৫৭), সিধো-কানহুর নেতৃত্বে হুল বিদ্রোহ (১৮৮৫), বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে মুণ্ডাদের অভ্যুত্থান (১৮৯৯)— এই ধরনের গণঅভ্যুত্থান বা বিদ্রোহ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের কর্তৃত্ববাদী শাসনকে বার বার চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছিল। তাই একদিকে সশস্ত্র প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে বিদ্রোহগুলিকে দমন করার প্রচেষ্টা তো ছিলই, পাশাপাশি জমিদার-জোতদার ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিদের হাতে নামমাত্র প্রশাসনিক ক্ষমতা তুলে দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যেই স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত উল্লিখিত আইনগুলি প্রণীত হয়েছিল। অর্থাৎ এও ছিল এক ধরনের 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি।

স্বাধীনতার পর ব্রিটিশ সরকারের পারিতোষিকে তৃপ্ত জমিদার-জোতদাররা রাষ্ট্র ক্ষমতার ভাগ পেলেন। এতদিন পঞ্চায়েতে দখলদারি ধরে রাখার জন্য মাথার ওপর ব্রিটিশ প্রভুদের তোয়াজ করতে হত। এখন স্বাধীনভাবেই মৌরসী পাট্টা কায়েম করার সুযোগ তেরি হল।

এপর্যন্ত আলোচনার পরে যে প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই ওঠে তা হল—দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এবং ঘটা করে আইন প্রণয়ন করা হলেও, সাধারণ মানুষের পঞ্চায়েত গড়ে উঠল না কেন? কেনই বা রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজীর পরিকল্পনা আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হল না। এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ভূমি সম্পর্কের মধ্যেই। পঞ্চায়েত আইনের মতোই পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত আইন সংসদে পাশ করানো হয়। কিন্তু রাজ্যে রাজ্যে জমিদার-জোতদারেরা ছিল শাসন ক্ষমতার অংশীদার আর এই ক্ষমতার প্রধান উৎস ছিল জমির ওপর তাদের মালিকানা। স্বভাবতই সংসদে প্রণীত আইনকে কার্যকরী করার জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন, সামন্তপ্রভুদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের তা ছিল না। ফলে আইনের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে স্বনামে-বেনামে প্রায় সমস্ত জমিই তারা দখল রাখে।

ভূমি সম্পর্কের কার্যত কোনো পরিবর্তন না হওয়ার ফলে, গ্রাম ভারতের সিংহভাগ মানুষের আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন অধরা থেকে যায়। আর্থিক ক্ষমতা জমিদার-জোতদার ও কায়েমী স্বার্থের হাতে কুক্ষিগত থাকার ফলে, সামাজিক নিপীড়ন ও রাজনৈতিক শোষণ অব্যাহত থাকে। ফলে তৎকালীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে যতটুকু উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হত, সেখানে গ্রামের গরিব মানুষের মতামত প্রদানের কোনো সুযোগ ছিল না। উন্নয়নের সুফলও তাঁদের ঘরে পৌঁছত না। জমিদার বা জোতদারের কাছারি বাড়িতেই বসতো পঞ্চায়েতের সভা। সেটাই পঞ্চাতের অফিস। বিডিও-থানা- পুলিশ, এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন অফিসার, কো-অপারেটিভ সোসাইটি কর্মকর্তা সকলেই গ্রামীণ মাতব্বরদের কথায় ওঠা-বসা করত। এইসব পঞ্চায়েতগুলিতে দীর্ঘদিন কোনো নির্বাচন হতো না। ফলে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত হয়ে উঠেছিল বাস্তুঘুঘুর বাসা। পঞ্চায়েতের এই চেহারা আমাদের রাজ্যে এবং অন্যান্য রাজ্যেও ছিল ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত।

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা সরকার গঠিত হয় এবং পঞ্চয়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে অশোক মেহেতার নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ। ই এম এস তাঁর সুপারিশে পঞ্চায়েতকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়ার ওপর জোর দেন। পঞ্চায়েতের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ও ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টিও তিনি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন। রাজ্যের হাতে অধিক অর্থ ও ক্ষমতা প্রদান করা এবং রাজ্যের প্রাপ্তির একাংশ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচ করার সুপারিশই করেন নাম্বুদ্রিপাদ।

ই এম এস প্রদত্ত মতামতকে গ্রহণ করে অশোক মেহেতা কমিটি কয়েকটি যুগান্তকারী সুপারিশ করেছিল। যেমন রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, নির্দিষ্ট সময়ে র্নিবাচন, পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, এবং পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস। অশোক মেহেতা কমিটির সুপারিশকে অনুসরণ করে ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কায়েমী স্বার্থবাদীদের পরাস্ত করে, গ্রামের গরিব, নিপীড়িত মানুষ পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব পায়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ ছিলেন ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, গ্রামীন কারিগর, বেকার, শিক্ষক ও নিজের চমি চাষ করেন এমন কৃষক।

১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে তিন দশক জুড়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার যে বিপুল সাফল্য, তাকে বুঝতে হলে পশ্চিমবাংলার ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর সাফল্যকে আলোচনার মধ্যে আনতে হবে। কারণ বাস্তুঘুঘুদের বাসায় প্রথম আঘাত হেনেছিল এই ভূমি সংস্কার কর্মসূচী। সারা দেশে ভূমিসংস্কার থেকে ও উপকৃত পরিবারগুলির শতকরা ৫৩.২ ভাগই পশ্চিমবঙ্গের। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যত পরিবারকে খাস জমি বণ্টন করা হয়েছে তার ৫৬ শতাংশই তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিভুক্ত। সারা দেশের কৃষি জমির মাত্র তিন শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে থাকা সত্ত্বেও, সারা দেশে যত জমি পুনর্বণ্টিত হয়েছে তার ২২ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে। সারা দেশে গড়ে যখন ১৫ শতাংশের হাতে ৬০ শতাংশ কৃষি জমি, তখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের হাতে রয়েছে ৭৮ শতাংশ জমির মালিকানা। ১৫ লক্ষের অধিক বর্গাদারের মেয়াদী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ২০০৬ সাল থেকে শুরু হয়েছিল চাষ ও বসবাসের ভূমিদান প্রকল্প। এই সফল ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর ফলে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে তা ৫৬ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নেমে আসে। ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। ২০০৬ সালেই জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ প্রতিবছর প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকার শিল্পপণ্য কেনেন। ১৯৯৪-৯৪ থেকে ২০০৩-০৪, ঐ সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৬৪ শতাংশ, যখন রাজ্যগুলির গড় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ১.৫৩ শতাংশ। কৃষি ক্ষেত্রের এই সাফল্য শিল্প বিকাশের পথকেও প্রশস্ত করেছিল। ১৯৯১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ১১৮০টি শিল্প ইউনিট রাজ্যে মোট ২৮ হাজার ৯১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

গ্রামীন অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সাহায্য করেছিল। শুরুর দিকে পঞ্চায়েতের কাজে সর্বাধিক গুরুত্ব পেল ভূমি সংস্কার, বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করা, গ্রামীন মানুষের জন্য বাস্তু জমির পাট্টা দেওয়া, নানা বীজের মিনিকিট বিলি-বণ্টন, ডিজেল চালিত পাম্পিং মেশিন দেওয়া। এছাড়াও ছিল রাস্তা নির্মাণ, টিউবয়েল বসানো, পুকুরের সংস্কার করে মাছ চাষ, গ্রামের কারিগরদের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা, সেচের জন্য খাল কাটা, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, নদীতে বাঁধ নির্মাণ, নদীর ভাঙ্গন রোঝে ব্যবস্থা প্রভৃতি। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলগুলিকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল পঞ্চায়েতকে। স্কুল বাড়ি নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতেই তুলে দেওয়া হল অর্থ। বৈদ্যুতিকরণ ও বনসৃজনের কাজ শুরু হল জোরকদমে।

সকলের জন্য শিক্ষা এই পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সাক্ষরতা অভিযান শুরু হল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। সাক্ষরতার কর্মসূচীকে আন্দোলনের স্তরে উন্নীত করার ফলে, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। এর স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনিসেফ থেকে সরকারকে পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি খেলাধূলার প্রসার ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে পঞ্চায়েত বিশেষ ভূমিকা পালন করতে শুরু করল। প্রতি বছর পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় ছাত্র-যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হতে শুরু হল।

১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই তিনটি স্তরে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত হল। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনের সময় থেকে প্রধান, সভাপতি ও সভাধিপতি এই তিন পদের জন্যই সংরক্ষণ করা হল। এক কথায়, ভারতীয় সংবিধানের একাদশতম তফশিলে গ্রাম জীবনের যে ঊনত্রিশটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, তার সবগুলোই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কার্যকরী হয়েছিল বামফ্রন্টের আমলে।

গ্রামের মানুষের আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া, আদান-প্রদানের এই প্রাতিষ্ঠানিক মঞ্চটি গত এগারো-বারো বছরে আগ্রাসী রাজনীতি আর দুর্নীতির আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে। সমস্ত স্তরের প্রশাসনিক কাজে দুর্নীতি এখন স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসকদলের নেতা-কর্মীরা সরকারী প্রকল্পের টাকা থেকে কাটমানি হিসেবে নির্বিচারে লুট করে চলেছে। জনগণের নিজস্ব পঞ্চায়েত এখন আমলা নির্ভর রাজা (সরকার) ও প্রজার (জনগণ) মিডিয়েটর। সরকারী পরিষেবার ওপর একান্তই নির্ভরশীল (কোভিড পর্ব এই নির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি করেছে) গ্রামের মানুষকে হাতে অথবা ভাতে মারার ভয় দেখিয়ে নির্বিচারে লুট করা হচ্ছে সরকারী অর্থ।

প্রায় এক দশক এইভাবে চললেও, ভয় ভাঙতে শুরু করেছে। মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে। লুটেরাদের হাত থেকে পঞ্চায়েতকে রক্ষা করার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সংগ্রামে যুক্ত ছিলাম। ৮ মার্চ ছুটি থাকায় আজ এই সভা। গত ১০ মার্চ আমরা একটি বৃহত্তর সংগ্রাম-আন্দোলনে খুব সফলভাবে যুক্ত ছিলাম, ফলে মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের একটি ইতিহাস সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। অতীতের ইতিহাসকে ধারণ করে নিয়েই আমরা বিভিন্ন কর্মসূচী করেছি ও করব, মে দিবসের আলোচনা পর্বের প্রেক্ষাপট বা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেক্ষাপট—যাই বলুন না কেন, সামগ্রিক লড়াই আন্দোলনের মধ্যেই আমরা যুক্ত থাকি। ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে শুধুমাত্র দাবিদাওয়া নয়, ট্রেডের বাইরের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিয়েই সংগ্রাম আন্দোলন করতে হয়। এই নিরিখে দাঁড়িয়েই আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচী। নারী দিবসের কর্মসূচী শুধুমাত্র নারীদের নয়, পুরুষ-নারী উভয়েরই।" এই নারী দিবসের যে প্রেক্ষাপট, তা তিনি সংক্ষিপ্তাকারে বলেন---"এই সমানাধিকারের লড়াই বহু বছর ধরেই চলছে। নারীদের সমানাধিকারের বিষয়টি দার্শনিক কার্লমার্কস ১৮৬৮ সালে শ্রমিকদের প্রথম আন্তর্জাতিক থেকেই দাবি করেন। ১৮৭১ সালে প্যারিসে যে বিপ্লব হয়েছিল সেখানে মহিলাদের অভূতপূর্ব ভূমিকা বিশ্বের নারী সমাজকে বহুলাংশে উজ্জীবিত করেছিল। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে বিশ্ববরেণ্য কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি উত্থাপন করেন, পাশাপাশি ভোটাধিকারের দাবিও উত্থাপিত হয়। ১৯০৭ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে ক্লারা জেটকিন শুধুমাত্র সম্পাদিকা নির্বাচিত হননি, পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্দোলনও সংগঠিত করেন। এই প্রবাহেই ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কের দর্জি মহিলারা গর্জে ওঠেন বিভিন্ন দাবির সাথে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেন হেগেন শহরে ২য় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে ৮ মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ১৯১৪ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন স্বীকৃতি পায়।"

পাশাপাশি তিনি বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির তাৎপর্যও সংক্ষিপ্তভাবে বলেন, আমাদের দেশের শাসক দল মনুবাদের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের ইতিহাসকে যেভাবে বিকৃত করছে এবং আমাদের উপর যে আক্রমণ নামিয়ে আনছে তার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে আমাদের নারী সমাজের উপর। এই পরিস্থিতিতে আজ যে আলোচনা হবে তাতে আমরা অবশ্যই সমৃদ্ধ হবো এবং আমাদের কর্মস্থলে যেখানে অনেকরকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে মহিলাদের কাজ করানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সমানাধিকারের পক্ষে লড়াই আমরা আগেও করেছি, গত ১০ তারিখেও করেছি। ১০ তারিখের ধর্মঘটের মাধ্যমে যে বার্তা এসেছে, শুধুমাত্র মহার্ঘভাতা অর্জন নয়, দেশে বিভাজনের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রের উপর যে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, তাকে প্রতিহত করার যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি আজকের এই আলোচনায় আমরা সমৃদ্ধ হয়ে তাকে

নারী দিবস (দার্জিলিং)

কার্যকরী রূপায়নে আমরা যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাব এবং এই কর্মসূচী সফল হবে।"

এরপরে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহিলা উপসমিতির আহ্বায়ক সুতপা হাজরা। ১১৩তম আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "এই বছরটি কমিউনিস্ট ইস্তেহারের ১৭৫ বছর। যে বইয়ে ঘোষিত হয়েছিল দুনিয়ার মজদুর এক হও, যে মজদুর নারী পুরুষ উভয় পৃথিবী পাল্টানোর স্বপ্ন দেখত। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো আন্দোলন নেই যেখানে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সফল হয়েছে। ১১৩ বছর পরে আমরা এই দিনে যে সমস্ত দাবিগুলি করি তার মধ্যে সমানাধিকারের দাবিগুলির কতটা আমরা অর্জন করতে পেরেছি? সমানাধিকারের দাবিগুলি। Global Gender Gaping Rate-এ ১৫৬টি দেশের মধ্যে ১৪০তম জায়গায় আমরা আছি। আমাদের রাজ্যেই যদি দেখেন, সমবেতনের জায়গায় যেখানে পুরুষদের মজুরি ৩০৫ টাকা সেখানে মহিলাদের ২৪৬ টাকা। জাতীয় গড় যেখানে পুরুষদের ৩০৫ টাকা ও মহিলাদের ২৭৫ টাকা। মোট শ্রমশক্তিতে যদি দেখি মহিলাদের যোগদান কত? ভারতবর্ষ পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা দেশ---১৬.১%। সেখানে বাংলাদেশ ৩০.৫%, শ্রীলঙ্কা ৩৩.৭%। মহিলাদের গার্হস্থ শ্রমকে কখনোই তুলে ধরা হয় না মোট শ্রমশক্তিতে। আমাদের দেশে গার্হস্থ শ্রমকে খুব স্বাভাবিক হিসাবে দেখা হয়। রাজ্যের শ্রমিক Kay Pertal-এ দেখা যায় মোট ২ কোটি ৫৭ লক্ষ, তার মধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ মহিলা যাদের বয়স ১৮-৪০-এর মধ্যে যারা বিভিন্ন টায়ারে কাজের সাথে যুক্ত। এদের সম্বন্ধে বাজেটে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে কার্যত কিছু হয় না। রাজ্যে স্বাস্থ্য ও খাদ্যের সাথে যুক্ত অসংখ্য অসংগঠিত শ্রমিক আছে যেমন, রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি প্রায় ২ লক্ষ, আশাকর্মীরা প্রায় ৫৫ হাজার আছে, মিড-ডে মিল কর্মী প্রায় ২ লক্ষ। এদের কার্যত সরকার কোনোরকম সুরক্ষা দিতে পারে না। কোভিডের সময় বিশেষত আশাকর্মীরা যেভাবে শ্রম দিয়েছিল তার সামান্যতম সাম্মানিক আর্থিক সুরক্ষা বর্তমান সরকার তাদের দেয়নি। দেশের ক্রাইম ব্যুরোর রেকর্ড বলছে, নথীভুক্ত ক্রাইমের সংখ্যা ২ লক্ষ ২৮ হাজার। এই নথীভুক্ত ক্রাইম বেশিরভাগই হচ্ছে সংগঠিত ও সংঘটিত। এর মধ্যে রয়েছে যেমন ধর্ষণ, পণপ্রথাজনিত হত্যা ইত্যাদি। এর বাইরে অনথীভুক্ত ক্রাইম আরো আছে। কন্যাভ্রূণ হত্যা, নারী পাচার ইত্যাদি এইরকম ক্রাইমের বড় কুফল—মহিলাদের সংখ্যা হ্রাস হওয়া। ১৯০১ সালে প্রতি হাজারে যেখানে মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৯৭১ জন, আজ ২০২০ সালে সেই সংখ্যা ৯২৪ অর্থাৎ মহিলাদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। উত্তর ভারতে এমন কিছু রাজ্য আছে সেখানের বেশ কিছু জেলা মহিলা শূন্য। আমরা যারা সংগঠিত শ্রেণী নেতৃত্বে আছি মাত্র চার শতাংশ, কিন্তু এর বাইরে ৯৬ শতাংশ যে অসংগঠিত শ্রেণী আছে তাদেরকে মূল লড়াই-আন্দোলনের সাথে যুক্ত না করে আমরা কখনোই এগিয়ে যেতে পারব না। আমাদের উপর যে আক্রমণ নেমে আসে সেটা শুধুমাত্র শারীরিক নয়, সেটা সামাজিক ও অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আজকের দিনে আমাদের সেক্টরে যে দাবিগুলি সাধারণত প্রতি বছর থাকে যেগুলো এখনো অর্জন করতে পারিনি। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের আলাদা

নারী দিবস (পূর্ব বর্ধমান)

টয়লেট সব জায়গায় এখনো হয়নি। সন্তান সম্ভবা মহিলাদের অফিস টাইমে পরিবহনে একটু সুবিধা দান করতে পারিনি। মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ এখনো হয়নি, সংসদে এখন ১৪ শতাংশ আছে, এ লড়াই আমাদের থাকবে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যেটা কন্যা ভ্রূণহত্যা, পণপ্রথা জনিত মৃত্যু, ধর্ষণ, গার্হস্থ হিংসা এই সমস্ত লড়াই লড়তে হচ্ছে আমাদের এবং লড়তে লড়তেই সে তৈরি হয় শ্রমজীবী মহিলা। আজ এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এটাই ঘোষিত হোক যে এটা লড়াইয়ে স্পর্ধা জাগানোর দিন, যে লড়াইয়ের মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়বে প্রতিটি শহর থেকে গ্রামে, যে লড়াই হবে আমাদের দাবির লড়াই, ন্যায্য প্রাপ্তির লড়াই, মনুষ্যত্বের লড়াই, আমাদের দেশ বাঁচানোর ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই। দেশে এখন একটা ইসলামিক ফোবিয়া তৈরি করা হচ্ছে। আর. এস এস.-এর মহিলা শাখা কর্মসূচী গ্রহণ করছে গর্ভাধারণ থেকে দু'বছর বা ১০০০ দিনের কর্মসূচী যেখানে গর্ভাধারণ থেকে সংস্কৃত পড়তে হবে, রামচরিত মানস, হনুমান চাল্লিশা, শিবাজীর উপাখ্যান পড়তে হবে। তার ফলে দেশ একটি করে মনুবাদী সংস্কৃতি প্রেমী ছেলে পাবে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের সকলের, আগামী দিনে যেন সবাই একসাথে লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হতে পারি, সেই উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করব।"

পরিশেষে এই সভার মূল আলোচক অধ্যাপক আবদুল কাফী বক্তব্য রাখেন। সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, সমানাধিকার, সাম্য, মানবাধিকার এইরকম কতকগুলি শব্দ আমরা বলি বা বলতে ভালোবাসি। কিন্তু মুশকিল হয়ে থাকে এই সমানাধিকারের লড়াই যখন একটি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক অভিমুখ হওয়ার চেষ্টা করে তখন। মূল বিষয় সমানাধিকার বা আমরা সবাই সমান। আমরা কোনো তারতম্য করি না, কিন্তু তারতম্য কেন হয়? এই সমানাধিকারের দাবি কেন উঠছে? মানুষ হিসাবে আমরা সমান আছি কিন্তু এটাকে নানাভাবে, নানা প্রকারে ঢেকে রাখা, আটকে রাখা, গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। যে বৈষম্য বা অদক্ষতা চোখে পড়ে তা সম্পূর্ণভাবেই পরিকল্পিত। সাধারণত সমানত্বই স্বাভাবিক এবং অসামানত্ব অস্বাভাবিক। এটা একটা বিশ্বাস বা দর্শনের বিষয়। এই লড়াইয়ের একটি ইতিহাস আছে।" এই লড়াইয়ের তাৎপর্য বা সূচনা হিসাবে তিনি বলেন, "ইউরোপের কিছু দেশে, সোভিয়েত তৈরি হওয়ার আগে বা পরে, বিপ্লবের ঈষৎ আগে বা পরে কিভাবে নারী আন্দোলন একটু একটু করে বিকশিত হয়েছে তার খতিয়ান আমরা দেখেছি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গগুলি হল—নারী পুরুষের অনুপাত যে ক্রমহ্রাসমান, এটা কেন ঘটে? ঘটার তো কথা নয়। আমাদের দেশের

নারী দিবস (পুরুলিয়া)

পরিপ্রেক্ষিতে এই কন্যা ভ্রূণ হত্যা—এটা যে একটা বিশাল সঙ্কট এবং এক শ্রেণীর মানুষ এই হত্যাকে ন্যায্য বলে মনে করে, কখনো কখনো শাসক ও শোষক এটাকে সমর্থনও করে, সেগুলি আমাদের নজরে রাখা প্রয়োজন। ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতিতে যখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চরম পরীক্ষার মুখে, তখন দেশের সরকার ৪ এপ্রিল '২০ একটি নোটিশ ঘোষণা করে কোভিডের জন্য কিছু কিছু আইন শিথিলের সাথে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের আইনও শিথিল করার। কিন্তু বৃন্দা কারাত সহ বিভিন্ন প্রগতিশীল নেতার প্রতিবাদ আন্দোলনের ফলে এটা কার্যকরী করতে পারেনি সরকার। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু উত্তর ভারতকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমাদের রাজ্যেও, আমাদেরও চাপ আসে। পুরুষ সন্তানের জন্য উদ্দীপনা, আকাঙ্খা এসব আছে। সাধারণত আমরা প্রায় সকলেই এই ভাবনায় চালিত হই, এটা মাথায় রাখতে হবে। "তিনি খুব ছোটো ও সুন্দর দুটি কবিতা পড়ে শোনান---দশম শতাব্দীর একজন কন্নড় শিবভক্ত কবির কবিতা, কবি দেবা দাসী রামাইয়া। এই কবিতা দুটি রুখে দাঁড়ানোর, প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার কবিতা। সমানাধিকারের প্রশ্নে তিনি সকলের পাঠ্য বলে মনে করেন একটি বই—"পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি।"

কিভাবে পরিবারের একটি কাঠামোকে আমাদের শোষণের যান্ত্রিকতায় টেনে নেয় সেটা পরিষ্কার। কন্যাভ্রূণ হত্যা সম্পর্কে তিনি সবিস্তারে যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করেন। সম্মান লড়াই এবং সম্মান রক্ষার্থে হত্যা এ বিষয়েও তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। সাধারণ শোষকরা মহিলাদের শোষণের বেড়াজালে জড়িয়ে রাখার জন্য মহিলাদের কিভাবে তথাকথিত অতীব সম্মান প্রদান করে, কিভাবে তাদের পূজ্য বানিয়ে তোলে তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন এই সমানাধিকারের লড়াই শুধুমাত্র মহিলাদের নয়, এ লড়াই নারী, পুরুষ উভয়ের। সুতরাং সবাইকেই সমানভাবে উন্নত মানসিকতায় এই লড়াইয়ের অংশীদার হতে হবে।

শেষে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে দেবলা মুখার্জী তাঁর সমাপ্তি বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

কুমকুম মিত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

অপেক্ষায় থাকা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ

অভিযুক্ত? না! সরকারী মতে এদের অপরাধ রাজ্যের লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মনের যন্ত্রনাকে তারা দুর্ভেদ্য দূর্গে পরিণত করা রাজ্য সচিবালয়ে সোচ্চারে ভাষা দিয়েছেন; এদের অপরাধ বিগত কয়েক বছরে কর্মচারীদের প্রাপ্য হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে দিয়ে মেলা, খেলা, উৎসব, ক্লাব, পুজোর প্যান্ডেল বা কার্নিভালে খরচ হতে দেখে এঁরা প্রতিবাদ না করে পারেননি. এতেও শেষ হয়নি। এর পরেও সচিবালয়ের শীর্ষতল থেকে হুমকি বর্ষিত হয়েছে—"এখনো তো কারো চাকরি খাইনি!" স্বৈরাচারী শাসকেরা এমনই হয়। সত্তর দশকে আমাদের পূর্বসূরীরা যা দেখেছেন; এখন দেখছি আমরা। আর সম্যক উপলব্ধি করতে পারছি গত তিন দশকের সঙ্গে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর স্পষ্ট ফারাকটা। কিন্তু আসল কথা হল, কর্মচারী ও তাদের পরিবারের প্রতি এত প্রবল বঞ্চনা, উপেক্ষা, অবমাননা এবং সর্বোপরি কর্মচারীদের ভাতে মারার এমন দৃষ্টিভঙ্গী কি আমরা নতমস্তকে মেনে নিতে পারি? মেনে নেওয়া যায়? আমাদের পূর্বসূরীরা আত্মসমর্পণ করেননি, আমরাও করছিনা। বদলী করে, ভয় দেখিয়ে যে সংগঠন ভাঙ্গা যায়না তা প্রমান হয়েছে, যখন নবান্নে গ্রেপ্তার হওয়া কর্মচারী নেতৃত্বকে বীরের সংবর্ধনা দিয়ে কর্মচারী সমাজ বিক্ষোভ দেখিয়েছে রাজ্যজুড়ে, যখন বিধানসভা অভিযানে ৪৭ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করার পরের দিন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বিক্ষোভ জানিয়েছে হাজার হাজার কর্মচারী। প্রতিবাদের মুষ্ঠি হয়েছে আরও দৃঢ়।

অভিজ্ঞতা বলে সংগ্রাম আন্দোলনের সমগ্র পরিসরে কর্মচারী সমাজের মনোজগৎ যখন আলোড়িত হচ্ছে, ঠিক তখনই কর্মচারীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের গতি শ্লথ করার জন্য হাজির হয়েছে শাসকশ্রেণী তথা দলের তৃতীয় বাহিনী। তীব্র অর্থনৈতিক বঞ্চনা চলুক, অর্জিত অধিকারের ওপর আক্রমণ অব্যহত থাকুক, মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার জন্য জারি হোক কালা আদেশনামা, প্রতিহিংসামূলক বদলীর মধ্য দিয়ে আক্রান্ত হোক কর্মচারীর পাশাপাশি তার পরিবারের সদস্যরা, তবুও প্রতিবাদ করা যাবেনা। কারণ প্রভুরা রুষ্ট হবেন! অর্থনৈতিক বঞ্চনা? না এসব নিয়ে ভাবনার দরকার নেই, কারণ মাননীয়ার অনুপ্রেরণায় তারা হাজির বদলির ঝুলি নিয়ে, তাতেও প্রতিবাদ না থামলে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে সমাজবিরোধীদের, গলা টিপে ধরা হচ্ছে কর্মচারী থেকে শুরু করে যারা সমাজ গড়ার কারিগর সেই শিক্ষকদের। মহার্ঘভাতা? "ঘেউ ঘেউ করবেন না", নাকের বদলে নরুণ নিয়ে তারা হাজির আপনাদের সামনে। বকেয়া ৩৫ শতাংশ মহার্ঘভাতার বদলে নাও ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা, তারপর আবির খেলা হোক আনন্দে, ভাসিয়ে দাও মাননীয়াকে অভিনন্দনের বন্যায়। যদি আপনি পারিবারিক বাজেটের ঘাটতি, অফিসারদের দুর্ব্যবহার কিম্বা শূণ্যপদের চাপ, নিয়োগ দুর্নীতি, পরিবারের শিক্ষিত সন্তানের বেকারত্বের সমস্যা, তোলাবাজদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ফোঁস করে উঠে বিধানসভা অভিযানে পা মেলান, তাহলেই সরকারের পুলিশ পৌঁছে যাবে আপনার দুয়ারে। প্রবীণ থেকে নবীন, পুরুষ থেকে মহিলা প্রতিবাদ যতই নিরস্ত্র হোক প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে লালবাজারে। আর তারপর হত্যার চেষ্টাসহ জামিন অযোগ্য ধারা দিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা শুরু হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে আক্রমণ শেষ কথা বলে না। শেষ কথা বলে মানুষ। সময় যখন পরিপক্ক হয় তখন সেই কর্মচারীরাই, অর্থাৎ যাদের ভীরু কাপুরুষ বলে মনে হতো একসময়ে তারাই এগিয়ে আসে লড়াইয়ের ময়দানে। বর্তমানে সেটাই ঘটছে। মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ তার শরীরের ক্লেদকে ঝেড়ে ফেলে প্রতিবাদ নয় প্রত্যাঘাতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। এটা হল স্বতস্ফূর্ততা। অর্থাৎ element of spontaneity যা পরিস্থিতির মধ্যেই এর জন্ম হয়। কিন্তু পরিস্থিতির এই অগ্রগতির মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা তৈরি হলেই সমস্যার সমাধান ঘটে না, তার জন্য প্রয়োজন হয় সংগঠন। অর্থাৎ element of consciousness। পরিস্থিতি যখন তৈরি হয় তখন সংগঠনই পারে তা পক্ষে আনতে। এটাই সংগঠন বিজ্ঞান। অন্যথা হলেই, অর্থাৎ পরিস্থিতি তৈরি হল অথচ সংগঠন নেই। তা কখনোই সমস্যার সমাধান ঘটাতে পারবে না, বা আমাদের পক্ষে আসবেনা। সুতরাং সংগঠন প্রয়োজন। আর শুধুমাত্র সংগঠন নয়, প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সংগঠন, প্রয়োজন কর্মচারী সমাজের সার্বিক ঐক্যের। সেই লক্ষ্য নিয়েই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চের আহ্বানে বিগত বছরে ২০-২১ মে দু'দিনের গণঅবস্থান হয়েছে, ২৩ নভেম্বরে বিধানসভা অভিযান হয়েছে এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের পরেই এই ঐক্যকে সম্প্রসারিত করে প্রথমে কর্মবিরতি, সর্বশেষ ১০ মার্চে আমরা হাজির হয়েছি ঐক্যবদ্ধ ঐতিহাসিক ধর্মঘটে। এই ধর্মঘট ধারাবাহিক আন্দোলনের ফসল, ঐক্যবদ্ধ কর্মচারী আন্দোলনের ফসল।

১৯৫৬ সালে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন থেকেই যে সংগঠনটা কর্মচারী সমাজের অভ্যন্তরে যৌথ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল, যে সংগঠনটার নেতা-কর্মীরা তাদের মেধা, কর্মচারী সমাজের প্রতি ভালোবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে এক আধা ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে কর্মচারী সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, আর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে যাদের বরখাস্ত হতে হয়েছে, জরুরী অবস্থার সময়ে মিসায় আটক হতে হয়েছে সেই সংগঠন নিজেই ঐক্যবদ্ধ কর্মচারী আন্দোলনের পথিকৃৎ। সেই দিনে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজের অভ্যন্তরের যন্ত্রণা, বঞ্চনার সাপেক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্খার পাশাপাশি, সমাজের মধ্যবিত্ত অংশের বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামার ক্ষেত্রে দোদুল্যমান প্রবণতার প্রসঙ্গগুলির সাথে আজকের মিল রয়েছে বহু। একইসাথে এই প্রবণতাগুলিকে ধারণ করেই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কম্পাস হিসাবে মতাদর্শকে ব্যবহার কথা উল্লেখ করেছেন সেদিনের লড়াকু যোদ্ধারা, যা আজকের দিনেও সমানভাবে যেকোনো সংগঠনের ক্ষেত্রে সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক। খুব স্বাভাবিক কারণে আমাদের সংগঠন ঐক্যের পরিধিকে বাড়ানোর কথাই বলে, কিন্তু নীতি বহির্ভূত শর্তহীন ঐক্যের সমর্থন করে না। তাই আজ যখন আমরা ১০ মার্চে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছি তখন শুধুমাত্র বকেয়া মহার্ঘভাতা বা শূণ্যপদের নিয়োগের দাবি নয়, আমরা এই ধর্মঘটে যুক্ত করেছি স্থায়ী শূণ্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ, যুক্ত করেছি চুক্তিপ্রথার কর্মচারীদের নিয়মিত করণের সাথে সাথে বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিকে।

চারপাশে যদি একবার চোখ মেলে দেখা যায়, তবে দেখবো স্বৈরাচারী স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের মিনার একে একে ভেঙে পড়ছে। জনগণের দিকে তাক করা চর্তুমুখী ভয়ঙ্কর আক্রমণের রাষ্ট্রীয় পুরোহিতদের মানুষকে ভাগ করার স্বপ্ন সম্প্রতি ধাক্কা খেয়েছে বেশ কয়েকটি রাজ্যে। প্রমাণ হয়েছে কেউই অজেয় নয়। কারণ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দেশের শ্রমজীবী মানুষ---কৃষি ক্ষেত্র থেকে কলকারখানা সর্বত্র। এই রাজ্যও এখন নৈরাজ্যের স্বর্গভূমিতে পরিণত। শিল্প, কৃষি কিম্বা স্বাস্থ্য-শিক্ষা, গণতন্ত্র কিম্বা বাঙালীর গর্ব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র এবং সর্বোপরি প্রশাসন—সর্বত্র লুট, তোলাবাজি, দখলদারি, দলদাসত্ব, শাসকদলের হামলা, হুমকি দেখে মানুষের মন থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে দীর্ঘশ্বাস আর তীব্র ঘৃণা। এই ঘৃণাই মানুষকে নামিয়েছে রাজপথে---শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা, দোকানদার, ব্যবসায়ী আর অসংগঠিত শিল্পের শ্রমজীবীদের। নিজেদের অর্থনৈতিক দাবির পাশাপাশি এই ঘৃণা আর ক্ষোভের উদগীরণ হয়েছে সারা রাজ্যে গত ১০ মার্চের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। কর্মচারীদের দাবীর সাথে সাথে রাজ্যের সব অংশের মানুষের দীর্ঘশ্বাসকে যুক্ত করে আমরাও সেদিন প্রতিবাদ করেছি—করেছি ধর্মঘট। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ঝেড়ে, রাজ্যের বৃহৎ অংশের কর্মচারীরা, কেউ প্রত্যক্ষভাবে কেউ অপ্রত্যক্ষভাবে আমরা সবাই মিলিত হয়েছি এই মহাসংগ্রামে। কারণ রাজ্য সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন করার সঙ্গেই এখন জড়িয়ে গিয়েছে রাজ্য কর্মচারী ও তাদের পরিবারের আর্থিক ও অধিকারগত দাবীগুলির সমাধানের ভবিষ্যত। তাই ১০ মার্চ ধর্মঘট আন্দোলনের শেষ নয়, নতুন পথে, নতুন ভাবে চলার অঙ্গীকার; যে প্রত্যয় ঝরে পড়েছে প্রতিটি কর্মচারীর দেহভঙ্গীমায়। □

সুমন কান্তি নাগ

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য

শুধু ফলাফলের বিরুদ্ধে নয়, নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে হবে

কে হেমলতা
(সহ-সভাপতি, সি আই টি ইউ)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রামের ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আসছে। ভারতবর্ষের ট্রেডইউনিয়নের যৌথ আন্দোলনে অংশ হিসাবে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পতাকাতলেও সংগ্রাম পরিচালনা করেন আপনারা। দেশের সরকারের শোষণমূলক নীতির বিরুদ্ধে ট্রেডইউনিয়ন সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সকলকে আমি অভিনন্দিত করছি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করছি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন নেতা প্রয়াত ভবতোষ রায়কে, যিনি ছিলেন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পারস-এর সম্মানীয় কার্যকরী সভাপতি এবং ঐ সংগঠন গড়ে ওঠার সময়ে যাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আপনারা শ্রমজীবিদের অন্যান্য অংশকে সংগঠিত করা এবং তাদের দাবির পক্ষে লড়াই করার কাজও করে থাকেন, এজন্যও আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে আপনারা নানা সমস্যার কথা নিশ্চয়ই সম্মেলনে তুলে ধরেছেন। তৃণমূল সরকার এরাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর প্রায় এক দশকের বেশি সময় যেভাবে চাপ তৈরি হয়েছে, সমস্যা তৈরি হয়েছে তার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই এখানে মতামত দিয়েছেন এবং আমি নিশ্চিতভাবে জানি আগামীদিনেও এখানকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের নয়া উদারবাদী নীতিগুলির বিরুদ্ধেও লড়াই করবেন। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারই এই নীতিগুলি রাজ্য সরকারগুলির ওপর চাপিয়ে দেয়। এই সঙ্গে আমি আপনাদের ২৩ নভেম্বরের আন্দোলনের জন্যও অভিনন্দন জানাচ্ছি। ঐদিন বিক্ষোভ সমাবেশ করতে গিয়ে আপনারা রাজ্য সরকারের নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছেন এবং বহু কমরেড ক্ষতি স্বীকার করেছেন।

আপনাদের বিগত সম্মেলনের পর থেকে গত তিন বছর শুধু বাংলার শ্রমজীবিরা নন, শুধু ভারতের শ্রমজীবীরা নন, সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রমজীবিরা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছেন।আমরা সবাই অতিমারির কথা জানি। প্রথম থেকেই আতঙ্ক তৈরি করা হল— বলা হল রোগ অত্যন্ত দ্রুত ছড়াচ্ছে, চীনের উদাহরণ দিয়ে বলা হল সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, প্রথম দিকে পরিস্থিতি যখন অত খারাপ ছিল না, তখনই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই প্রচার করা হয়েছিল।তারপর তিন বছরে আমাদের কয়েক হাজার সহযোদ্ধা মারা গেছেন, আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ এবং সারা পৃথিবীতে কয়েক কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। কোটি কোটি মানুষ এর শিকার হয়েছেন। একশ বছরের মধ্যে এত ভয়াবহ স্বাস্থ্য সংকট হয়নি। আমাদের মনে হয়েছে, এত মানুষের যন্ত্রণা এবং এত মৃত্যু এ কি সত্যিই অনিবার্য ছিল? প্রথমদিকে যখন ভাইরাস নতুন, তার চরিত্র জানা ছিল না, কীভাবে তা কাজ করে জানা ছিল না— তখন নাহয় একরকম, কিন্তু পরের পর্যায়ে মানুষ রোগের কারণে মারা যায়নি। কারণ তখন ভ্যাকসিন এসে গেছে, বিজ্ঞানী এবং ডাক্তাররা জেনে গেছেন কী ধরণের চিকিৎসা প্রয়োজন, কী সতর্কতা নিতে হবে। তখনও বিশেষ করে পুঁজিবাদী দেশগুলির সরকার মানুষের জীবন বাঁচানো, তাদের জীবিকা ও আয়ের সুরক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। দিল্লি শহরেই আমরা দেখেছি মানুষ হাসপাতালের বাইরে মারা যাচ্ছেন, কারণ হাসপাতালের বেড নেই, অক্সিজেন নেই, প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাব। অথচ সরকারের প্রধানরা তখন পশ্চিমবঙ্গ এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। শুধু তাই নয়, বিজেপি সরকার ভ্যাকসিন আসার পর তা বিনামূল্যে না দিয়ে বেসরকারী হাসপাতালের হাতে তুলে দিল এবং রাজ্যগুলোকে তা কিনতে বাধ্য করা হল। বহু প্রতিবাদের পর যখন সেটা বন্ধ হল তখনও ২৫% ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে বৃহৎ কর্পোরেট হাসপাতালগুলোকে, দেশের খুব কম শহরেই সেগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে গরীব মানুষরা ভ্যাকসিন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। শুধু আমাদের দেশে নয়, এমনকি মহাশক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত কয়েক কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গরীব এবং শ্রমজীবি মানুষ, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। কোভিড দেখালো দেশের রাষ্ট্রপতি ঐ পরিস্থিতিতেও লাভ করছেন, অথচ সেখানে মানুষের সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের বিষয়টি সরকার অবহেলা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেসরকারী স্বাস্থ্যবীমার ওপর নির্ভরশীল, সরকারী স্বাস্থ্য বরাদ্দ খুব সামান্য। ইউরোপে, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশে আগে ন্যাশনাল হেল্থ সার্ভিস বা বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো ছিল, নয়া উদারবাদের পর্বে সেগুলিকেও প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে, যে কারণে সেইসব দেশেও প্রচুর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখলাম, সাধারণ মানুষের জন্য গৃহীত নীতি আর বৃহৎ কর্পোরেটদের মুনাফার জন্য গৃহীত নীতির মধ্যে ফারাক।

পাশাপাশি চীন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ কি করেছে আমরা দেখেছি। দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে যে চীন থেকে রোগটি ছড়িয়েছিল এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছে ইত্যাদি। প্রথমদিকে চীন রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল। এখন যেসব রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে আগের রিপোর্ট অনেক অতিরঞ্জিত ছিল।জিরো কোভিড নীতির জন্য হয়তো আমাদের এখানে প্রতিরোধ বেশি হয়েছে, চীনে কম হয়েছে। পরে তারা দ্রুত স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরেছে।

সংকটের সময়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের দেশে ঘটেছে, যাতে আমাদের দেশের হাল কী বোঝা গেছে— পরিযায়ী শ্রমিকদের মিছিল। আমরা দেখলাম কীভাবে লক্ষ-লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা থেকে, উত্তরপ্রদেশ, বিহার,রাজস্থান, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড প্রভৃতি রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কাজের জন্য গেছে— মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে। হঠাৎ লকডাউন ঘোষণা হওয়ায় এবং আমাদের দেশে অন্যতম কঠোর লকডাউন নীতি কার্যকর হওয়ায় তারা তাদের রোজগার, কাজ, আশ্রয় সব হারিয়ে বাধ্য হয়েছিল পায়ে হেঁটে নিজেদের পুরোনো গ্রামে বা শহরে ভিটেতে ফিরে যেতে। সরকার কোনো পরিবহনের ব্যবস্থা না রাখায় শয়ে শয়ে মাইল তারা হেঁটেছে এবং নারী-শিশু সহ তারা অনেকে পথশ্রমের অতিরিক্ত ক্লান্তিতে নি:শেষ হয়ে বা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এটা বিজেপি সরকারের নিষ্ঠুরতাকে চিহ্নিত করে। যাতে শ্রমিকরা কাজ এবং আশ্রয় না হারায় সেজন্য পরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু ৫২ দিন পরে আবার সেই নির্দেশ প্রত্যাহারও করে নেওয়া হয়।

দেখা গেছে কোভিডের বিধিনিষেধকে কাজে লাগিয়ে কর্পোরেটদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা হয়েছে যার মূল্য দিতে হয়েছে জনগণকে। এইসময়েই বিজেপি সরকার তিনটি কৃষি বিল পাশ করে। এটা করা হয় সংসদে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই এবং বামপন্থী সহ বিভিন্ন সাংসদ যখন এবিষয়ে ভোটাভুটির দাবি করেন তাদের সাসপেন্ড করা হয়। এর পরেই পাশ হয় তিনটি শ্রম কোড। এই সময়েই বেসরকারীকরণের একগুচ্ছ নীতিও সরকার পাশ করিয়ে নেয়। এমনকি ২০ লক্ষ কোটি টাকার যে প্যাকেজ সরকার ঘোষণা করে তাতেও জীবনজীবিকাকে সুরক্ষিত করার লক্ষে কোনো ব্যবস্থা ছিল না, শুধু ঋণের ক্ষেত্রে সুদের ওপর কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছিল, বরং কর্পোরেট স্বার্থই দেখা হয়েছে। এটাই বিজেপি সরকারের চরিত্র।

কোভিডের অনেক আগেই যদিও অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছিল। সাধারণভাবে তাকে 'আর্থিক সংকট' (ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস) বলা হলেও এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সংকট। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানিগুলির পতনের মধ্য দিয়ে তার শুরু হয় এবং গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সংকট মেটেনি, এখনও চলছে। কোভিডের আগেই আমাদের দেশে বেকারির হার এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যা তার আগের ৪৫ বছরের মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ। এরসঙ্গে ছিল ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি, মানুষের কাজ হারানো। কোভিড পরিস্থিতি এবং বিধিনিষেধ এই সংকটকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল। সারা পৃথিবীকে এই সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ইউরোপে, বলা হচ্ছে, গত চার দশকের মধ্যে এত মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি। যুক্তরাজ্যে খাবার রুটি থেকে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে যা চল্লিশ বছরে ঘটেনি। যুক্তরাষ্ট্রেও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। একদিকে মূল্যবৃদ্ধি অন্যদিকে অর্থনীতিতে বৃদ্ধির হারের শ্লথগতি। বেকারির সঙ্গে সঙ্গে কাজের শর্তের দারুণ অবনমন। এখন সবাই ভয় পাচ্ছে, শীঘ্রই আবার মন্দা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে ২০২৩-২৪ সালে। রিপোর্ট বলছে, জ্বালানির দাম আরও বাড়বে। এর সঙ্গে খাদ্যের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছে ইউক্রেন যুদ্ধই জ্বালানি দাম বাড়ার একমাত্র কারণ নয়, নয়া উদারনীতিতে বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের জন্যেও জ্বালানি দাম বেড়েছে।এই সবের বোঝা চেপেছে শ্রমজীবি মানুষের ওপর।

এখন পুঁজিবাদীরা তাদের সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তারা তাদের স্বার্থকে, মুনাফাকে সুরক্ষিত করছে, সম্পদ বৃদ্ধি করছে এবং এটা তারা করছে বিশেষ করে শ্রমিকদের ওপর বোঝা চাপিয়ে। ২০০৮ সালের সঙ্কটের সময়ে আমরা দেখেছিলাম কৃচ্ছ্রসাধনের নীতির নামে শ্রমিকদের ওপর বোঝা চাপানো হয়েছিল। গোটা ইউরোপে প্রায় সব পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি হ্রাস, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হ্রাস, কাজের ঘন্টা বৃদ্ধি ইত্যাদি হয়েছে। দেখেছি কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর মূল অধিকারগুলি, সংগঠিত হবার অধিকার, যৌথ দরকষাকষির অধিকার, সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলনের অধিকার। চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের কথা আপনারা বলছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে এবং আমাদের দেশে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা, সরকারী এবং অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেও, ক্রমশ কমছে। কাজের নিরাপত্তাহীন, মজুরীর নিরাপত্তাহীন, সামাজিক সুরক্ষাহীন অনিশ্চিত কাজের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে, ইউরোপে 'জিরো আওয়ার' চুক্তি বলে একটি বিষয় এসেছে; যখনই কোনো শ্রমিকের ডাক আসবে কাজের জন্য, তখনই তাকে যোগ দিতে হবে, যদি না যায় তাহলে আর চাকরি থাকবে না। নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি শ্রমিক, আংশিক সময়ের চুক্তি শ্রমিক, অস্থায়ী শ্রমিক— সবই বাড়ছে। গিগ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তো প্রথাগত মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক পর্যন্ত অনুপস্থিত। গিগ শ্রমিকদের বলা হচ্ছে যে তারা স্বাধীন। যখন ইচ্ছে হবে কাজ করবে, যখন ইচ্ছে হবে না কাজ করবে না। কিন্তু ওলা, উবের, সুইগিতে যারা কাজ করে তাদের কাজের কোনো নিরাপত্তা নেই, সামাজিক সুরক্ষা নেই। তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে অ্যাপ। নিয়োগকর্তার সঙ্গে তাদের সরাসরি সম্পর্ক নেই। গিগ ওয়ার্কারের ক্ষেত্রে গাড়ি কার নিজের, তেল তাকে ভারতে হয়, শ্রম তার, কিন্তু অ্যাপের মালিক মুনাফা করে। বর্তমানে এইধরণের কাজের সংখ্যা বাড়ছে এবং শোষণও বাড়ছে দারুণভাবে।

অতিমারির সময়ে আমরা দেখেছি, আমাদের দেশেও কিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পে, রত্ন ও অলঙ্কার শিল্পে, বিভিন্ন মেরামতির কাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানকার শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছেন। কোভিড পরিস্থিতির পরও তাদের বেশিরভাগই আর কাজ পাননি, এবং যারা কাজে ফিরেছেন তারা আরও খারাপ কাজের শর্তে ফিরেছেন মজুরি কমে গেছে, সামাজিক সুরক্ষা নেই ইত্যাদি। এই পরিস্থিতিতে মহিলাদের অবস্থা আরও খারাপ। পুরুষরা যদি বা কিছু কাজ ফিরে পেয়েছেন, মহিলাদের ক্ষেত্রে তা একেবারে নগন্য। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি যেভাবে প্রয়োগ হয়েছে তার জন্যই এটা হয়েছে।

এই সব আক্রমণ যেমন বাড়ছে, প্রতিবাদও বাড়ছে। এটা নয় যে শ্রমিকরা সব মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকায় বিপুল সংখ্যক আন্দোলন-ধর্মঘট হচ্ছে। রেল কর্মচারীরা, ডাককর্মীরা, নার্সরা, শিক্ষকেরা, ম্যানুফ্যাকচারিং শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন। এমনকি আমাজন, গুগল, স্টারবাকস, প্রভৃতির কর্মচারীরাও সংগঠিত হচ্ছে এবং ধর্মঘট করছে। এই সময়েই রেলওয়ে শ্রমিকরা বিরাট ধর্মঘট করেছেন ইউরোপে। যুক্তরাজ্যে এই প্রথম বিপুল সংখ্যায় নার্সরা ধর্মঘট করেছেন। সারা পৃথিবী জুড়ে এই সমস্ত আন্দোলনের দাবিগুলি প্রায় এক।

আমাদের দেশের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের কথা আপনাদের হান্নানদা বলেছেন, আপনারাও জানেন। ক্ষুদ্র কৃষির ওপর আক্রমণ হচ্ছে। কৃষি আইনের লক্ষ্য কী? আমাদের দেশে কৃষকদের ৮০ শতাংশ ক্ষুদ্রচাষী, যাদের জমির পরিমাণ ২ হেক্টরের নীচে। এদেশের কৃষি কৃষকনির্ভর। এখন কর্পোরেট কৃষি করার চেষ্টা হচ্ছে। কৃষিকে বৃহৎ কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, যার মধ্যে বিদেশী কোম্পানিও আছে। তারা ঠিক করবে কি উৎপাদন হবে, তাদের হাতে জমি তুলে দেওয়া হবে। সরকার শস্য সংগ্রহ থেকে সরে আসবে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য থাকবে না, গণ বন্টন ব্যবস্থাও থাকবে না এবং খাদ্য সুরক্ষায় আঘাত আসবে।এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্ষুদ্র কৃষকরা। আগে থেকেই কৃষিক্ষেত্র দারুণভাবে আক্রান্ত। প্রায় ৪ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন গত তিন দশকে। কারণ কৃষিতে উৎপাদন সামগ্রীর— বীজ, সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ, জল— সমস্ত কিছুর খরচ বাড়ছে, কিন্তু কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছে না। সরকার স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম সহায়ক মূল্য চালু করুক— এটা কৃষকদের অন্যতম দাবি। কৃষক আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ কৃষক রাস্তায় নেমেছে, রাজধানী শহরে ঢুকতে তাদের বাধা দেওয়ায় লক্ষ লক্ষ কৃষক সীমান্তে অবস্থান করেছে। তারা নিজেদের ইচ্ছায় করেনি, তারা বাধ্য হয়ে করেছে। এক বছর ধরে এই আন্দোলন চলেছে। সারা দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে।

হান্নানদা আপনাদের হয়তো বলেছেন এই আন্দোলনের তাৎপর্য কী ছিল। কৃষকরা জয়ী হয়েছে এবং সরকারকে তিনটি কৃষি আইন বাতিল করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু কৃষকদের আন্দোলনের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এটা বিরাট ব্যাপার। সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারীরা সমর্থন করেছেন— কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক—বীমার কর্মচারী, শুধু শ্রমিকদের মধ্য যারা একটু ভালো অবস্থায় আছেন তারাই নন, শ্রমিক হিসাবে যাদের স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই, মাসে ১০০০/২০০০ টাকা মজুরি পান যে মিড ডে মিল কর্মীরা, আশা কর্মীরা, ৪০০০ টাকা বেতন পান যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ,তারা পর্যন্ত অর্থ প্রদান করেছে।শুধু আর্থিকভাবে সহায়তা করা নয়, তারা কৃষকদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পাশে থেকেছেন।কেবল মাত্র পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে নয়, তামিলনাড়ু, কেরালা, তেলেঙ্গানা, পশ্চিমবাংলা থেকে হাজার হাজার শ্রমিক গিয়ে তিন- চার - দশ দিন পর্যন্ত কৃষকদের সঙ্গে তাদের তাঁবুতে থেকে এসেছে শ্রমিকরা। সারা ভারতের কৃষকদের দাবিগুলি নিয়ে লড়াই করেছে। কৃষকরা যখন গ্রামে লড়াই করছে, রাজধানীর সীমান্তে অবস্থান করছে তখন শহরের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে কৃষকদের সমস্যা, তাদের দাবিগুলি তুলে ধরেছে, প্রচার করেছে শ্রমিকরা। কৃষক আন্দোলন থেকে যে সংযুক্ত কৃষক মোর্চা তৈরি হয়েছিল সেখানেও শ্রমিকশ্রেণী ছিল। কোভিডের মধ্যেই ২৬ নভেম্বর, ২০২০-তে যখন কৃষকরা দিল্লির দিকে পদযাত্রা করছে তখন সারা দেশে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত মঞ্চের আহ্বানে ধর্মঘট করেছে।এর আগেও যৌথভাবে আন্দোলন হয়েছে এবং এর পরে যৌথ আন্দোলন আরও গতি পেয়েছে। শ্রমিক এবং কৃষক, যারা দেশের সম্পদ উৎপাদন করে, সেই দুটি অংশ ঐক্যের মধ্য দিয়ে যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তা সরকারকে পিছু হঠতে, কৃষকদের দাবি মেনে কৃষি আইন বাতিল করতে বাধ্য করেছে। □

অনুলিখন ঃ শাশ্বতী মজুমদার

(শেষাংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পরে

অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের সাক্ষাৎকার

ফ্ল্যাগ আমাদের কলকাতা থেকে তৈরি করে নিয়ে আসতে হয়েছে। যে চেন ফ্ল্যাগগুলি তৈরি করা হয়েছে তা কলকাতা থেকে ছাপিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। স্বভাবতই সঠিক সংখ্যা বলা মুশকিল।

প্রশ্ন ঃ তেভাগার ৭৫ ও সত্যজিৎ রায়ের ওপর যে দুটি প্রদর্শনী হয়েছে এখানে এ দুটোর মূল ভাবনা কার বা কাদের থেকে এসেছে?

উত্তর ঃ দেখুন সংগঠন কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রক বিষয় নয়। সংগঠন হচ্ছে সম্মিলিত মেধার স্কুল। সুতরাং কার ভাবনায় আসল বা কাদের এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কেন্দ্রীয়ভাবে যখন সিদ্ধান্ত আসল সত্যজিৎ রায়ের নামে বুক স্টল হবে তখনই আমরা জেলার পক্ষ থেকে একইভাবে ভাবলাম যে, সত্যজিৎ রায়ের নামে যখন বুক স্টল হবে তখন সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আমাদের কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু আমরা কি করতে পারি। আমরা দুটো জিনিস করতে পারতাম। সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আমরা সেমিনার করতে পারতাম কিন্তু আমরা ভাবলাম সম্মেলনের যে টাইট সিডিউল হবে সেখানে সেমিনার করা যাবে না। আমরা জেলাগত সেমিনার করতে পারতাম, কিন্তু জেলাগতভাবে সেমিনার করার ক্ষেত্রে আমরা দুটো বিষয় ধরেছিলাম। সেখানে রাম পুনিয়ানী থেকে শুরু করে অনেকে এসেছিলেন। সেক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ সেখানে আমাদের ছিল না, তখন আমরা চিন্তা করলাম, তাহলে আমরা সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে, সত্যজিৎ রায়ের বাছাই করা কয়েকটি ছবি নিয়ে প্রদর্শনী করব। আমি বলব অভ্রদীপ ঘটকের কথা। বাদ বাকিটা যেটা হয়েছে সেটা সার্বিকভাবে সবার মধ্য দিয়ে হয়েছে। সিনিয়র লিডারশিপ যেমন সাহায্য করেছেন, বর্তমান প্রজন্মের লিডারশিপও সাহায্য করেছেন। আলাদা করে কারও নাম করতে চাই না। তেভাগার ৭৫ নিয়ে বলি, তেভাগার ৭৫ নিয়ে জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে এটা আমরা করতে চেয়েছিলাম। পোস্টার প্রদর্শনী শুধু আমরা করতে চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের লড়াই আন্দোলনের যে গৌরব গাথা রয়েছে, আমাদের যারা সন্তানসন্ততিরা তারা কিভাবে বুঝতে পারে। তেভাগার কোনও ছবি সেভাবে আমাদের কাছে ছিল না। এই যে ছবিগুলি আঁকা হয়েছে এগুলো হচ্ছে কোনো একটা গল্প, কোনো একটা ঘটনার ইলাসস্ট্রেশনটা এখানে করা হয়েছে। স্বভাবতই সেখানে এই ছবিটাকে আঁকতে পাঁচবার, সাতবার, আটবার লেগেছে। দীপঙ্কর ধর বলে একজন শিল্পীকে দিয়ে আঁকানো হয়েছে। একাজেও আমাদের স্থানীয় কৃষক আন্দোলনের যারা নেতৃত্ব আছেন, সারা ভারত কৃষক সভার নেতৃত্ব যারা আছেন, জলপাইগুড়ির গণআন্দোলনের বিভিন্ন লাইব্রেরীর যে সমস্ত বই আছে, কলকাতাতেও যারা আছেন তাদের সকলের থেকে আমরা বইপত্র পেয়েছি। আমরা এগুলো ব্যাখ্যা করেছি। একটা ছবি বহুবার আঁকানো হয়েছে, বাতিল করা হয়েছে। চেষ্টা করতে করতে এক জায়গায় এসেছি। আমরা বলব না এটা পারফেক্ট, কিছু ত্রুটি এখনও আছে—যেটা আমাদের ঠিক করতে হবে। ৩৮টি আমাদের স্লাইড রয়েছে, যেটা আমরা ডকুমেন্টেশন করে নিয়েছি। কালকেই ডকুমেন্টেশনটা আমরা PDF করে প্রতিনিধিদের দিয়ে দেব এবং এটা নিয়ে কিছু বইও ছাপাবো। সত্যজিৎ রায়ের টাও Total Documentation তার একটা Cronology নির্মাণ করা হয়েছে, এটারও একটা Cronology নির্মাণ করা হয়েছে। এই দুটো Documentationই আমরা তৈরি করব। তৈরি করে PDF আকারে সোশ্যাল মিডিয়ায় যতটা দেওয়া যায় আমরা দেব। প্রতিনিধি যারা এসেছেন তাদেরকে দেব এবং কিছু বই আকারে প্রকাশ করে আমরা এগুলো পরিবারের অভ্যন্তরে বাচ্চাদের যেমন দেব তার সাথে বিভিন্ন গণসংগঠন, শ্রেণী সংগঠনগুলোকে দেব এবং এর মধ্য দিয়ে চাইব যে এটা প্রচার হোক। আর এটার যে প্রাথমিক পরিকল্পনা আঁকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে দীপঙ্কর ধরও করেছে। আরও একজন নির্মাণ, সাজানোতে সাহায্য করেছে অভিরূপ গাঙ্গুলী। এদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল এদের হচ্ছে এদের বয়স কম, অভ্রদীপের বয়স একটু বেশি। ৩৩-৩৪। বাকি দুজনের বয়স ৩০-এর নিচে। স্বভাবতই ওদেরকে পাওয়া সম্ভব হয়েছেন। নবীন এবং নব্যপ্রজন্মের কমরেড সকলেই সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন ঃ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন সভা, সেমিনার হয়েছে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে সেগুলোর মূল লক্ষ্য কী ছিল?

উত্তর ঃ সেমিনার আমরা দুটো বিষয়ের ওপর করেছি---(১) স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রমজীবীদের করণীয়। আলোচক ছিলেন ডঃ ইন্দু অগ্নিহোত্রী ও আমাদের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী। দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল ভারতের বহুত্ববাদীতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংগ্রাম। আলোচনা করেছিলেন রাম পুনিয়ানী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ আব্দুল কাফী। কোনটা সবচাইতে বেশি Eye catching, কোনটা সবচাইতে বেশি পেনিট্রেটিভ হতে পারে এই জায়গাটা আমরা ধরবার চেষ্টা করেছি। একদম পুরোপুরি একটা রসায়ন মানে পরীক্ষাগারে Laboratory Experiment-এর মতো করেই সম্মেলনটাকে আমরা দেখেছি এবং কোথায় Extra কী দিতে হবে, ডিটেইলনেস আনতে হবে। এর মধ্যে ছিল একটাই যে আমাদের প্রথমে নিজেদের মনের যে জায়গাটা সেই জায়গাটাকে আরেকটু উন্নত করতে হবে। আমাদের ভিতরের উদারতাটাকে আরেকটু বৃদ্ধি করতে হবে এবং মনের ভিতরের একদম গহন কোনে একটু টোকাটা মারা যায় কিনা? এই টোকাটা মারার চেষ্টা করেছি। এটা শুধুমাত্র আমাদের কমরেডদের মধ্যেই শুধু নয়, গণআন্দোলনের মধ্যেও টোকাটা পড়েছে, গণআন্দোলনের নেতৃত্বরাও সেটা বলছেন।

প্রশ্ন ঃ প্রতিনিধিদের থাকার জন্য মোট কতগুলি আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল?

উত্তর ঃ মোট আটটি আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার মধ্যে মহিলাদের জন্য দুটি সবচেয়ে ভালো আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা আমরা কি কিছু পেয়েছি না, তারা একদমই সহযোগিতা করেননি?

উত্তর ঃ স্থানীয় প্রশাসন অসহযোগিতা করেছেন এটা বলব না, তারা বাধা দেননি। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে তারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি। আমি বলব সহযোগিতার চেয়েও এটা বলব যে পারেননি অসহযোগিতা করতে। অসহযোগিতা করবার মতো জায়গাটা বা সে সাহসটা বা উন্নাসিকতা দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে ভীত করার সাহসটা পায়নি। কারণ এতটাই চোখে চোখ রেখে লড়াই হয়েছে যে সেটা করতে পারেননি।

প্রশ্ন ঃ রাজ্য সম্মেলনের লোগো তৈরির পিছনে কী ভাবনা কাজ করেছে? কারা কারা যুক্ত ছিলেন। ডায়নামিক স্ক্রীন নির্মাণে কারা যুক্ত, কী কী বিষয়ের ওপর হয়েছে?

উত্তর ঃ লোগোটার বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে যেটা চিন্তা করা হয়েছিল জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে যেটা প্রথমে আসে, জলপাইগুড়িতে যেভাবে আন্দোলনের ধারাটা নির্মিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে রেল শ্রমিকদের আন্দোলন। চা বাগান শ্রমিকদের আন্দোলন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের আন্দোলন এবং আমাদের মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের ধারাটা ওর থেকেই উদ্ভুত হয়েছে। রেল শ্রমিক আন্দোলন বলতে বোঝায় কমরেড জ্যোতি বসুর নাম। জ্যোতি বসু দোমহনী স্টেশন থেকে মালবাজার পর্যন্ত এহেন রেল গুমটি নেই যেখানে তিনি রাত্রিবাস করেননি। এটা জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে গৌরবজ্জ্বল ব্যাপার। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যেহেতু রাজ্য সম্মেলন হচ্ছে, রেল শ্রমিকদের বিষয়টা আমাদের রাখতে হবে। এখন এটার ওপর Primarily আমরা কাজ করতে শুরু করি, যার জন্য রেল লাইনটা, এরপর আমাদের দেখাতে হবে রাজবংশীরা যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কৃষিভিত্তিক আন্দোলন এবং চিয়াকামান মজদুরদের আন্দোলনকে যুক্ত করতে হবে। তার জন্য ওটাকে আমাদের মার্জ করতে হয়েছে এবং আমরা আরেকটাও জিনিস বুঝি সেটা হচ্ছে Idologically, যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে সংগঠন মানে গতি। এবার যখনই আমি ওটা চক্র করে দিলাম রেল লাইনটাকে নিয়ে তখন ওটা মনে হচ্ছে। ওটা ক্রমাগত ঘুরতে থাকছে। আর ওই রেলগাড়িটাও একটা Motion বোঝায়। রেলগাড়ির যে ইঞ্জিনটা ব্যবহার করা হয়েছে ওটা কিন্তু আগের ইঞ্জিন; স্টীম লাইনের ইঞ্জিন। ওই কারণে ওই ইঞ্জিনটাকে ধরা হয়েছে। জ্যোতি বসুকে শ্রদ্ধার্ঘ রেখেই এটা নির্মাণ করা হয়েছে। এর স্কেচটা করেছে লুবিয়াঙ্কা নন্দী মিত্র। প্রাথমিকভাবে যে চেষ্টা হয়, এটাকে গ্র্যাফিক্যালি ফুটিয়ে তুলেছেন অভিরূপ গাঙ্গুলী। Voice of Art কৌশিক সেন, চিত্রনাট্য Intially লিখেছে সত্যদা এবং ওটাকে আমি Modify করেছি, Modify মানে দু-চারটে লাইন যুক্ত করেছি। ডায়নামিক স্ক্রিন আমি, অনিক মিত্র, বানীব্রত সাহা মিলে করেছি, গ্রাফিক্স ডিজাইন দীপঙ্কর ধর। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

একাধিক মহারথীদের বিরুদ্ধে অর্জুন যুদ্ধ করে জয়ী হন। আপনারাও যদি সাহস করে এটা বলতে পারেন যেখানে খুশি বদলী করুন— আমরা দাবি আদায়ের আন্দোলন থেকে একপাও পিছনে সরব না—তাহলে এই আন্দোলনে জিত অপনাদের অবশ্যম্ভাবী। অন্যান্য রাজ্যেও আপনাদের মতো আক্রমণ আছে, কিন্তু তারা পিছু হটছে না দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত। যদি আপনারা এটা ভেবে থাকেন মহার্ঘভাতা পেয়ে যাবেন, সব দাবি আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু আমার কোনো অসুবিধা হবে না—এটা সম্ভব নয়। সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করব, তারা আক্রমণ করবে না এটা হতে পারে না। আপনারা লড়াই করুন। Reach the unreach নয় ভাবুন Reach each। সব ধরনের কর্মচারীদের নিয়ে বৃহৎ ঐক্য গড়ে তুলুন। কৃষক আন্দোলনের শিক্ষা আমাদের আছে। পাঁচ শতাধিক বেশি সংগঠন-বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী সব সংগঠনকে এক ছাতার তলায় এনে সাধারণ দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করে মোদিজীকে কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিল। কর্মচারীদের ঐক্যকে মজবুত করুন সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই-এ। সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি— আপনাদের কোনো জঙ্গী কর্মসূচীর জন্য আপনাদের গায়ে যদি আঁচড় পড়ে সারা দেশে প্রতিবাদ ধ্বনিত হবে। দেশের কর্মচারী সমাজ আপনাদের হয়ে পথে নামবে। আপনারা এগোন, আপনাদের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে সারা দেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ৮ ডিসেম্বর দিল্লীর তালকোটরা স্টেডিয়ামে জাতীয় যৌথ কনভেনশন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, চুক্তির কর্মচারীরা ৬০ বছর পর্যন্ত কাজ করবে এবং একই কাজে একই বেতন প্রদান করতে হবে—এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে। পি এফ আর ডি এ রদ করতে হবে। শূন্যপদে নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। বেকারদের চাকরি দিতে হবে। বিপুল শূন্যপদের জন্য আমাদের এখন অবস্থা হয়েছে একজন কর্মচারী তিন জনের কাজ একাই করছেন, যেটা স্বাভাবিক নয়। তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতির দায় আমাদের কর্মচারীদের উপর এসে পড়ছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করে মালিক নয়। তাই বিক্রি করার কোনো অধিকার সরকারের নেই। ৮তম বেতন কমিশন ২০২৬-এর জানুয়ারি থেকে লাগু করতে হবে। ১৮ মাসের বকেয়া দিতে হবে। বকেয়া ডি.এ অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। কোভিডে নিয়মিত বা অনিয়মিত মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকরি দিতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০২৩-এর মধ্যে সমস্ত রাজ্যের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মিলিত কনভেনশন হবে। এরপর বাজেট অধিবেশনে সংসদে ও বাইরে একদিনের ধরণা হবে। এপ্রিল থেকে জেলা ও ব্লক স্তরে কনভেনশন হবে। জুলাই-সেপ্টেম্বর সারা দেশজুড়ে জাঠা হবে, যা মিলিত হবে দিল্লীতে বিরাট জমায়েতের মাধ্যমে এবং সেখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকালীন হরতালের ডাক দেওয়া হবে। এরা ভাবছে হিন্দু-মুসলমান তাস খেলে আমাদের ঐক্য ভেঙে ২০২৪-এ তৃতীয়বারের জন্য মসনদে আসীন হবে—আমরাও হুঁশিয়ারি দিচ্ছি আমরা পুরো শক্তি নিয়োজিত করব আপনাদের মসনদে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে রদ করতে। এ রাজ্যে কনভেনশনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও আসবেন। আমরা আরও বলতে চাই এখনো পর্যন্ত কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা-কর্মীদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার চলেছে বা চলছে আগামী দিনে এটা চলতে থাকলে পুরো দেশের কর্মচারীরা এদের পক্ষে প্রতিবাদে নামবে। পরিশেষে আপনাদের জানাতে চাই বিদগ্ধ নেতৃত্ব কমরেড সুকোমল সেনের নামে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের যে সংগঠন দপ্তর তৈরি হয়েছে তাতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক অনুদান দিয়েছে—এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। □

অনুলিখন ঃ সুতপা হাজরা

নবান্নের ছয় জন ধর্মঘটকারী কর্মচারীর বদলীর আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে মুখ্যসচিবকে চিঠি

Memo No. Co-ordi/28/23 Date : 27.03.2023

To
The Additional Chief Secretary
Department of Personnel & Administrative Reforms (CCW)
State Secretariat, Nabanna, 7th Floor
325, Sarat Chatterjee Road, Shibpur, Howrah

Sir,

I would like to draw your attention to the fact that the services of six employees, namely Shri Sajal Chakrabarty, UDA; Shri Barun Mitra, UDA; Shri Saroj Das, HA; Shri Sunil Kumar Singh, HA and Shri Apurba Roy, HA, borne in the Secretariat Common Cadre of Upper Division Assistants and Head Assistants are placed on detailment at the Offices of different blocks in Purulia and Bankura District in the cliche-ridden 'interest of public service' vide Order No. 53-PAR (CCW)/EStt. Dated 24.03.2023.

All the six employees are posted in different Departments at Nabanna in Howrah and actively participated in the strike on 10th March, 2023 called by various organizations of Government employees. It is clear that they are detailed for their participation in the strike. It is nothing but an act of vengeance which is highly condemnable.

We demand that the afore-mentioned order be revoked immediately and all the six employees be brought back to their orginal places of service.

We would request you to give us an appointment for deputation at the earliest so that we may discuss the matter with you.

Yours faithfully,

Biswajit Gupta Chowdhury

(Biswajit Gupta Chowdhury)
General Secretary
State Co-ordination Committee

জেলা সম্মেলন

বীরভূম

বিগত ২৭ নভেম্বর ২০২২ বীরভূম জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্মেলন সিউড়িতে কমরেড পবিত্র কর্মকার মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রাক্কালে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য। জেলার যুগ্ম সম্পাদক সৌমেন চ্যাটার্জী প্রতিবেদন উত্থাপন করেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কৃশানু চ্যাটার্জী। উত্থাপিত প্রতিবেদন ও আয়ব্যয়ের হিসাবের উপর আলোচনা করেন ২ জন মহিলা সহ ২১ জন। জবাবী বক্তব্য পেশ করেন বিদায়ী জেলা সম্পাদক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ বীরভূম জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী। প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন থেকে ৩৬ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন থেকে নিম্নলিখিত পদাধিকারী নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি—সুদীপ্ত গুহ, সম্পাদক—সৌমেন চ্যাটার্জী, যুগ্ম সম্পাদক—আশীষ দাস, কোষাধ্যক্ষ—কৃশানু চ্যাটার্জী। □

পূর্ব বর্ধমান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পূর্ব বর্ধমান জেলার ২০তম জেলা সম্মেলন সাফল্যের সাথে মলয় রায় নগর (বর্ধমান) ও বাদল দাস মঞ্চে (কর্মচারীভবন, পারবীরহাটা) অনুষ্ঠিত হল। জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি অভিজিৎ রায়। অভিজিৎ রায়, রীনা কোনার ও শিবশংকর খাঁকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন। সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং সংগঠনের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সজল রাজা। সম্মেলনে খসড়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শংকর ভট্টাচার্য এবং ৮টি প্রস্তাব পেশ করেন সহ-সম্পাদক চন্দন বিশ্বাস ও সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অপর সহ-সম্পাদক দেব কুমার দত্ত। ২৫ জন মহিলা প্রতিনিধি সহ সর্বমোট ২৬৫ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আগামীদিনের লড়াই ও আন্দোলনের দিশা নির্দিষ্ট করল সম্মেলন। ২টি মহকুমা, ১৫টি ব্লক, ৭টি অঞ্চল ও ২৫টি অন্তর্ভুক্ত সমিতি সহ সর্বমোট ৪৩ জন প্রতিনিধির বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ছায়া মণ্ডলকে সভাপতি, বিদ্যুৎ দাসকে সম্পাদক, দেব কুমার দত্তকে যুগ্ম-সম্পাদক এবং শংকর ভট্টাচার্যকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করেন এবং ৫৩ জনের জেলার কমিটি ও ১৯ জনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী আগামী দিনের কর্মচারী স্বার্থবাহী আন্দোলনকে জেলার অভ্যন্তরে আরও তীব্র করার শপথ গ্রহণ করে। □

সম্মেলন সংবাদ

পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং অর্জিত অধিকার রক্ষায় বৃহত্তর কর্মচারী সমাজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই-আন্দোলনের শপথ নিয়ে ৪ মার্চ, ২০২৩ ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টাল একাউন্টস এন্ড অডিট অফিসার্স অ্যাসো-সিয়েশনের ১৩শ-১৪শ রাজ্য সম্মেলন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হল হাওড়া শরৎ সদনে। সম্মেলন থেকে আওয়াজ ওঠে ১০ মার্চ-এর ধর্মঘটের সমর্থনে এবং সর্বাত্মক অংশগ্রহণের পক্ষে। সুখেন্দু ঘোষকে সভাপতি এবং মানস মুখোপাধ্যায়কে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে ৩৩ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। এছাড়াও ৫ জনের একটি উপদেষ্টামণ্ডলীও গঠিত হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। □

রক্তদান

গত ২৫ নভেম্বর ২০২২ ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ৪৫তম রক্তদান কর্মসূচী কেন্দ্রীভাবে কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর সম্পাদক অভিজিৎ বোস। এই কর্মসূচীতে শতাধিক কর্মচারী ও প্রাক্তন নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। রক্তদান কর্মসূচীতে উদ্বোধক ও অস্থায়ী কর্মচারী সহ মোট ৫১ জন রক্ত দিয়েছেন। গত ২৩ নভেম্বর বিধানসভা অভিযানে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া সমিতির অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন নেতা বিমল রায়কে সমিতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধিত করেন উদ্বোধক অভিজিৎ বোস। □

রাজ্যে চালু হচ্ছে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি

এক বছর আগে কেন্দ্রের নয়া শিক্ষা নীতির বিরোধিতা করেছিল রাজ্য সরকার। ঘোষণা করেছিল আলাদা শিক্ষানীতি তৈরির। কিন্তু এখন আর. এস. এস-র মস্তিষ্ক প্রসূত মোদি সরকারের সেই শিক্ষা নীতিই রাজ্যে প্রয়োগ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর রাজ্যের কলেজগুলিতে আগামী জুলাই থেকে চালু হবে কেন্দ্রের 'জাতীয় শিক্ষা নীতি'। কলেজগুলিকে সেই অনুসারে নিজেদের পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর।

প্রায় এক বছর আগে ৮ এপ্রিল ২০২২ জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে রাজ্যের অবস্থান ছিল এর বিপরীত। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সেদিন বলেছিলেন, ''কেন্দ্রীয় সরকার যে শিক্ষানীতি তৈরি করেছে তা মিসিগান এবং অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হুবহু অনুকরণ। আমরা সেই শিক্ষা নীতি মানছি না। তাই নিজস্ব শিক্ষানীতি তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছি।'' এরপর দশজনের একটি কমিটি গড়া হয়েছিল 'রাজ্যের শিক্ষানীতি' তৈরির জন্য। কমিটি নাকি রিপোর্টও দিয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। যদিও তা জনসমক্ষে আনা হয়নি। এখন কেন্দ্রের শিক্ষা নীতি প্রবর্তনের উদ্যোগ চলছে। এক বছরের মধ্যে সরকারের মত কোনো কারণে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে গেল এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নতুন শিক্ষানীতি জুলাই থেকে চালু করা হবে অথচ সেই অনুযায়ী সিলেবাস তৈরি হয়নি। তিন বছরের জায়গায় চার বছর স্নাতক পর্যায়ে পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। আরও অনেক ক্লাসরুম প্রয়োজন। তার চেয়েও বড় কথা আরও অনেক শিক্ষক, অধ্যাপক নিয়োগ করা দরকার। এই বিষয়ে শিক্ষক-অধ্যাপকদের সাথে কোনো আলোচনা রাজ্য সরকার করেনি। শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই স্নাতকোত্তর স্তরের ৫৫ টি বিভাগে প্রায় ৫০ শতাংশ অধ্যাপকের পদ খালি। পদ আছে ৭৯৩ জন, অধ্যাপক আছেন ৩৯৫ জন। নতুন শিক্ষানীতি চালু করতে গেলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত অধ্যাপক নিয়োগের।

ভাবার বিষয় আরো আছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে অনেক অন্ধকার দিক আছে যার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠানো শিক্ষানীতির ৫.১.৪ ধারায় বলা আছে, ছাত্রদের একটি আধুনিক ভারতের ভাষায় এবং ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। 'মাতৃভাষা' লেখা হয়নি। লেখা হয়েছে আধুনিক ভারতের ভাষা। সেটা কি তবে হিন্দি? আর. এস. এস.-র লুকানো এজেন্ডা কার্যকর করতেই কি তাড়াহুড়ো করে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে যাওয়া? এটা সময়ই বলবে। তবে নয়া 'জাতীয় শিক্ষা নীতি'-র বিরুদ্ধে শিক্ষাবিদ, ছাত্র সমাজ শুরুর দিন থেকেই সংগ্রামের ময়দানে আছে। □

পুঁজিবাদের সঙ্কট
বিক্রি হল ক্রেডিট সুইসে ব্যাঙ্ক

সঙ্কটের জেরে প্রথমে দেউলিয়া ঘোষণা, শেষমেশ বিক্রি হয়ে গেল বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৩০টি ব্যাঙ্কের অন্যতম ক্রেডিট সুইসে ব্যাঙ্ক। তাদের কিনেছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ইউ বি এস, যারা ক্রেডিট সুইসের মতোই সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক বহুজাতিক ব্যাঙ্ক।

পুঁজিবাদী সঙ্কট কাটাতে রাষ্ট্রের ভূমিকা এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে। ক্রেডিট সুইসে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার প্রভাব বিশ্ব মূলধনী বাজারে যখন পড়তে শুরু করে তখন এর পরিত্রাতা হয়ে এই ব্যাঙ্ককে ৫৪০০ কোটি ডলার ঋণ দিতে রাজি হয় সুইস সরকার। এতেও শেয়ার ধস আটকানো যায়নি। টালমাটাল পরিস্থিতিতে সুইস সরকারের মধ্যস্থতাতেই ৩২৫০ কোটি ডলারের বিনিময়ে ক্রেডিট সুইসে কিনে নিতে রাজি হয় ইউ বি এস। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব লগ্নিপুঁজির বাজারকেও বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সুইস রাষ্ট্রপতি অ্যালেইন বারসেট নিজেই জানিয়েছেন, ''পরিস্থিতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবনতির দিকে যাচ্ছিল দেখে লগ্নিপুঁজির বাজার বাঁচাতে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া উপায় ছিল না।'' শুধু তাই নয়, এই অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে সুইস সরকার ১০ হাজার কোটি ফ্রাঙ্ক সাহায্য করবে। তাছাড়াও ইউ বি এস-এর ক্ষতি সামলাতে ৯০০ কোটি ডলার দেবে সরকার। অর্থাৎ লগ্নিপুঁজির সঙ্কট উদ্ধারে জনগণের অর্থ ব্যয়িত হবে। ক্রেডিট সুইসের ৫০ হাজার কর্মচারীর ভবিষ্যৎ চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। তা নিয়ে কারোর মাথা ব্যাথা নেই। ইউ বি এস সূত্রে বলা হয়েছে ক্রেডিট সুইসের ১.৪ লক্ষ কোটি ডলারের সম্পদের কিছু অংশ বিক্রি করে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ক্রেডিট সুইসের আগেই পর পর তিনটি মার্কিন ব্যাঙ্কের পতন ঘটেছে। সিলিকন ভ্যালি ব্যাঙ্ক, সিগনেচার ব্যাঙ্কের পতনের পর আমেরিকার ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাঙ্কের সম্পদ তলানিতে নেমে যায়। তাদের শেয়ারের মূল্য ৭০ শতাংশ কমে যায়। এই ব্যাঙ্ককে বাঁচাতে জে পি মর্গান চেজ সিটি গ্রুপ, ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা, গোল্ডম্যান স্যাচ, মর্গান স্ট্যানলির মতো বৃহৎ আকারের মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি মিলিত ভাবে ৩০০০ কোটি ডলার এই ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে জমা দিয়েছে। এই প্রক্রিয়াতে মধ্যস্থতা করেছেন মার্কিন অর্থ সচিব জানেত ইয়েলেন ও ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেয়োসে পাওয়েল। লগ্নিপুঁজির সঙ্কট মোচনে রাষ্ট্রের এইরকম প্রত্যক্ষ সহায়ক ভূমিকা প্রতিপালন অভূতপূর্ব। এতদ্ সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে দিশা আজও হাতড়ে চলেছে বিশ্ব পুঁজিবাদ। □

প্রসঙ্গ সাধারণ বাজেট—২০২৩-২৪

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ লোকসভায় কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। দেশের বর্তমান সঙ্কটজনক আর্থিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাজেট জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। প্রয়োজন ছিল জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ। কর্মসংস্থান এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি। কিন্তু বাজেটে তার প্রতিফলন ঘটেনি। অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতো এই বাজেট সঙ্কোচনমূলক (Contractionary)।

কেন্দ্রের বাজেট এমন একসময়ে পেশ করা হয়েছে যখন দেশের অর্থনীতিতে অধোগতি চলছে। এই অধোগতি কোভিড অতিমারির আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। অতিমারির দু'বছরে তা আরও খারাপ অবস্থায় পৌঁছে যায়। এই পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বাড়ানোর মতো কেন্দ্রীয় বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া দরকার ছিল। সেই পথে না হেঁটে উল্টে ধনীদের আরও কর ছাড় দিতে কোষাগারীয় ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে সঙ্কুচিত করা হয়েছে সরকারী বিনিয়োগ। এমন এক সময়ে এই বাজেট পেশ করা হল যখন অক্সফ্যাম রিপোর্ট স্পষ্টই জানিয়েছে, ভারতের ধনীতম ১ শতাংশের কাছে গত দু'বছরে তৈরি হওয়া সম্পদের ৪০.৫ শতাংশ কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। এর ফলে সঙ্কোচনমূলক বাজেটের ধাক্কায় অর্থনৈতিক সঙ্কট আরও ঘনীভূতই হবে।

এবারের বাজেট প্রস্তাবে ২০২৩-২৪ সালের মোট সরকারী ব্যয় ২০২২-২৩-র সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় মাত্র ৭ শতাংশ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। জিডিপি বৃদ্ধির হারে (১০.৫ শতাংশ) তুলনায় তা সামান্যতম বৃদ্ধি। জিডিপির শতাংশের নিরিখে সরকারী বিনিয়োগও কমানো হয়েছে। বিনিয়োগে বৃদ্ধির হার মাত্র ৫.৪ শতাংশ। বেকারত্বের হার যখন এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তখন রেগায় বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে ৩৩ শতাংশ। খাদ্যপণ্যে ভরতুকি কমানো হয়েছে ৯০ হাজার কোটি টাকা। সারে ভরতুকি কমানো হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা এবং পেট্রোলিয়ামে ৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। অতিমারির ভয়ঙ্কর প্রভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিপর্যস্ত হলেও স্বাস্থ্যখাতে গত বছরের বরাদ্দ ৯২৫০ কোটি টাকা খরচই করতে পারেনি সরকার। একইভাবে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ৪২৯৭ কোটি টাকা খরচ হয়নি। আইসিডিএস কর্মীদের ভাতা বাড়ানো হয়নি। মহিলাদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৯ শতাংশ। এস সি জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ, সেই খাতে বাজেটে বরাদ্দ মাত্র ৩.৫ শতাংশ, এসটি জনসংখ্যা ৮.৬ শতাংশ হলেও বরাদ্দ মাত্র ২.৭ শতাংশ। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার ফাঁপা বুলি চুপসে যায় যখন দেখা যায় যে পি এম কিষান ফান্ডে বরাদ্দ গতবারের ৬৮০০০ কোটি টাকা থেকে নেমে ৬০০০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সরকার আরও দাবি করছে যে মূলধনী ব্যয়ের ভালো পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বেশি বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ২০২২-২৩ সালের সংশোধিত বরাদ্দেই দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাসমূহের সম্পদ ধরলেও এবারের বাজেটে মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র ৯.৬ শতাংশ।

বেতনভুক কর্মচারীদের সামান্য স্বস্তি দিতে কর ছাড়ের উর্ধ্বসীমা ৫ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। যদিও মুদ্রাস্ফীতির নিরিখে এই বৃদ্ধি সামান্যই। এরই সঙ্গে সামাজিক খাতে বরাদ্দ হ্রাস করার ফলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রে জনগণকে আরও বেশি খরচ করতে হচ্ছে।

প্রয়োজন ছিল কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্পে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ভাতা বাড়িয়ে রেগায় বরাদ্দ বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি, সম্পদ ও উত্তরাধিকার কর চাপানো ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া। বরং এর বিপরীত পথে হেঁটেছে জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেট। □

প্রসঙ্গ ঃ রাজ্য বাজেট ২০২৩-২৪

কেন্দ্রীয় বাজেটের অভিমুখেই গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় পেশ হয়েছে রাজ্য বাজেট। কাজের সুযোগ সৃষ্টি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, গ্রামোন্নয়ন থেকে সামাজিক সুরক্ষা—রাজ্যের অগ্রগতির প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ কমিয়ে আর্থিক বিকাশের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে এবারের রাজ্য বাজেটে। ২০২৩-২৪ সালের বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন এই বাজেট কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে।

বাজেটে মূলধনী খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। কর্মসংস্থানের কোনো নতুন ঘোষণা নেই, নেই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নতুন কোনো ঘোষণা। রাজ্যের ৩৩৫৭টি পঞ্চায়েতের গ্রামোন্নয়নের চালু প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি নামমাত্র ১৪২২ কোটি টাকা। আর্থিক বিকাশের জন্য গত বছরের বরাদ্দ ছিল ৫৭, ০৪৯.২০ কোটি টাকা। এ বছর এই খাতে বৃদ্ধি মাত্র ১৩৬ কোটি টাকা। আবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো চিরকুট থেকে দেখে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য মাত্র ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করলেও বাজেট প্রস্তাবে লিখিতভাবে এর কোনো উল্লেখ নেই।

বাজেটে মদ বিক্রি করে ১৭ হাজার কোটি টাকা আয়ের পথ দেখানোর পাশাপাশি ঋণকে আয়ের সূত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্য চলবে ধারের টাকা আর মদ বিক্রির টাকায়। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যে পরিমান আয় হবে বলে রাজ্য সরকার বাজেট প্রস্তাবে দাবি করেছে, তার ২৫.৪ শতাংশ আসবে বাজার থেকে ধারের মধ্য দিয়ে। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকার সরে যাবার সময় রাজ্যের পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা। এখন যা বেড়ে প্রায় তিনগুণ। বাজেটে নেই শিল্প সম্মেলনগুলি তেকে বিনিয়োগ প্রস্তাবের বাস্তবায়নের হদিশ।

সামাজিকভাবে বলতে গেলে কিছু চটকদারি বক্তব্য ছাড়া এবারের রাজ্য বাজেটে সাধারণ মানুষ, বেকার যুবক যুবতীদের জন্য কোনো দিশা নেই। □

রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে নয়া দিল্লীর সমাবেশ থেকে রাজ্য সরকারের বহুমুখী আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ এবং রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ

বিগত ৫ এপ্রিল ২০২৩ মজদুর-কিষাণ সংঘর্ষ সমাবেশে অংশগ্রহণ করার জন্য সারা দেশের শ্রমিক, কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের কাছে 'দিল্লী চলো' ডাক দিয়েছিল সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন (সি আই টি ইউ), সারা ভারত কৃষক সভা (এ আই কে এস) এবং সারা ভারত ক্ষেতমজদুর ইউনিয়ন (এ আই এ ডব্লু ইউ)। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-কৃষক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আহূত এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করার জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক ও ক্ষেতমজুর যেমন দিল্লী পৌঁছেছেন, তেমনি মধ্যবিত্ত কর্মচারী ও শিক্ষকদের জাতীয় ফেডারেশনগুলি এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করে, তাদের অনুগামীদেরও এই সমাবেশে অংশগ্রহণের আবেদন জানায়। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো কর্মচারী এই সমাবেশে যোগদান করেছেন। সেখানে রামলীলা ময়দানের মূল সমাবেশে অংশগ্রহণ করার আগে ময়দান সংলগ্ন অঞ্চলে তাদের নিজস্ব আর্থিক ও অধিকারগত দাবি নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। একই সাথে শ্রমিক, কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতিও সংহতি জ্ঞাপন করেন। দাবি-দাওয়া সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুনে সুসজ্জিত এই বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি সুভাষ লাম্বা, কোষাধ্যক্ষ শশীকান্ত রাই এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। বিক্ষোভ সভা থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করে ঐ সভার পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। □

রাজধানীর রাজপথে দৃপ্ত মিছিলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

নয়া দিল্লীর বিক্ষোভ সভায় সংহতি জানিয়ে বক্তব্যরত সুভাষা লাম্বা

রাষ্ট্রপতিকে প্রেরিত পত্র

Memo No. Co-ordi/31/23

Date : 05.04.2023

To
The Hon'ble President of India
Rashtrapati Bhavan
New Delhi,

Sub. : A humble submission from the employees and teachers of West Bengal, who draw their salaries from the state exchequer.

Respected Madam,

I, the undersigned, being the General Secretary of the largest organisation of the state government employees in West Bengal and also the convener of a joint platform of the employees, teachers and non-teaching employees of that state, with deep reverence crave leave to lay before your Honour, our following submission, for Your Honour's generous consideration and necessary intervention as your Honour may deem appropriate.

Your Honour may probably be aware, that the employees and teachers of West Bengal, although entitled to get Dearness Allowance at per with the rate sanctioned by the Union Government for the employees working in different central government offices, have been getting only 6 per cent of it and lagging behind the central government employees and the employees of almost all other states by 36 per cent. Amidst a time when price hike of essential commodities is a regular phenomenon, the state government's reluctance to requisite percentage of D.A in accordance with the rate sanctioned by the Central Government (based on the All India Consumer Price Index), which is an earned right and also upheld by the Hon'ble High Court at Calcutta, is causing discontent amongst the employees and teachers, We have been trying to persuade the State Government about this lawful demand, through various democratic norms, but with no result till date. Moreover, instead of paying heed to our said lawful demand, the state government has resorted the undemocratic path to curb the trade union rights of the employees and teachers by imposing various punitive measures. These unlawful administrative steps taken by the state government stand country to the spirit of our constitution.

In this circumstance, I, on behalf of the deprived and affected employees and teachers of West Bengal, solicit an effective intervention from Your Honour's end.

With regards,

Yours faithfully

Biswajit Gupta Chowdhury
(Biswajit Gupta Chowdhury)
General Secretary
State Co-ordination Committee

জেলায় জেলায় আন্দোলন কর্মসূচী

আলিপুরদুয়ার

জলপাইগুড়ি

বাঁকুড়া

উত্তর ২৪ পরগনা

উত্তর-পূর্ব ভারতের তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন

বিগত ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মা জুড়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ড রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২ মার্চ এই তিনটি রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে কোনো রাজ্যেই সরকার পরিবর্তন ঘটেনি। ত্রিপুরায় বি জে পি-আই পি এফ টি জোট আবারও সরকার গড়তে চলেছে, মেঘালয়ে জয়লাভ করেছে ইন্ডিয়ান পিপলস্ পার্টি (এন পি পি) এবং নাগাল্যান্ডে পুনরায় সরকার গড়ছে এন ডি পি পি-বি জে পি জোট।

বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৬০টি বিধানসভা আসনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরে দেখা যায় শাসকদল বিজেপি ৩২টি (জোট সঙ্গী আই পি এফ টি ১টি আসন), বামফ্রন্ট-কংগ্রেসের জোট ১৪টি আসন (যার মধ্যে বামফ্রন্ট ১১টি ও কংগ্রেস ৩টি) এবং তিপ্রা মোধা পার্টি ১৩টি আসন পেয়েছে।

শতাংশের বিচারে বিজেপি জোট পেয়েছে ৩৯ শতাংশ ভোট (বিগত নির্বাচনে যা ছিল ৪৩.৫৯ শতাংশ), বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোট পেয়েছে ৩৩.২ শতাংশ ভোট (৪৪.৩৫ শতাংশ ভোট) ও অন্যান্যরা পেয়েছে ২২.১২ শতাংশ ভোট। এই ভোটের লক্ষণীয় দিক হল, ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে রাজ পরিবারের বর্তমান সদস্য প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মার নেতৃত্বাধীন তিপ্রা মোধা পার্টি ভালো ফল করেছে, স্বাভাবিক ভাবেই ত্রিমুখী নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন শাসক জোট নির্বাচনে ভোট ভাগের সুযোগ পেয়েছে। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেস ২৮টি আসনে প্রার্থী দিলেও এবারের নির্বাচনে খাতা খুলতে পারেনি।

৬০ আসন বিশিষ্ট নাগাল্যান্ড বিধানসভায় বিজেপি-এনদিপিপি জোট ৩৭টি আসন পেয়ে সরকার গড়েছে। যার মধ্যে বিজেপি ১২টি ও এনডিপিপি ২৫টি আসন পেয়েছে। এছাড়া এন সি পি ৬, এন পি পি ৫, এন পি এফ ২, জেডি(ইউ) ১, আর পি আই ২ এবং নির্দল প্রার্থীরা ৪টি আসনে জয়যুক্ত হয়েছে।

মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনে সর্বমোট ৬০টি আসনের মধ্যে এন পি পি জোট ২৬টি আসনে জিতেছে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ৩০টি আসনের থেকে ৪টি কম, ইউ ডি পি ১১টি আসন, কংগ্রেস ও টি এম সি উভয়ই ৫টি করে আসন জিতেছে এবং অন্যান্যরা ১০টি আসনে জয়যুক্ত হয়েছে। □

সাগরদিঘি উপনির্বাচন ও আজকের বাংলা

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সাগরিদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, ৩ মার্চ ফল প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিগত বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ৫০ হাজার ভোটে জেতা আসনে শাসক দলকে হারিয়ে বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস জয়যুক্ত হলেন ২২,১৮০ ভোটের ব্যবধানে। কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন ৮৭,৬৬৭টি ভোট, অর্থাৎ শতাংশের বিচারে মোট ভোটের ৪৭.৩৫ শতাংশ ভোট। এবারের ত্রিমুখী লড়াইয়ে বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ মাত্র ১৪ শতাংশ, তবুও দ্বিমেরুকরণের রাজনীতিকে সরিয়ে রেখে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধীশক্তি হিসাবে বাম-কংগ্রেস জোট উঠে আসার নতুন প্রবণতা রাজ্যের রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। □

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রিট, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত।